অনন্যপ্রতিভা রামানুজন

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারী ১৯৬১

প্রচ্ছদ : প্রদীপকুমার পাত্র

প্রকাশক

অরুণ পুরকায়স্থ

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক

হরিহর প্রেস

৯৩/২ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৯

মা-বাবা

ও

দাদার

পুণ্যস্মৃতিতে

ভূমিকা

শ্রীনিবাস রামানুজন মাত্র ৩৩ বছর বেঁচেছিলেন, তারই মধ্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ গণিত-প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল। তাঁর গণিত গবেষণার বিষয়ে বিদগ্ধ জন আলোচনা করেছেন ও করবেন। তাতে সাধারণের বোধগম্য বিশেষ কিছু থাকে না। কিন্তু যে ব্যক্তি আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ না করেও কেবল স্বীয় প্রচেষ্টায় এবং প্রতিভার জোরে উচ্চ গণিত নিয়ে গবেষণা করতে পারেন এবং বহু নতুন অবদান দাবি করতে পারেন, তাঁর জীবনকথা জানা এবং তা থেকে শিক্ষালাভ করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

প্রতিভার উৎস নির্ধারণ করা যায় না। কোন আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতেও তাকে লাভ করা যায় না। এই প্রতিভা প্রায়শ চোখের আড়ালেই থেকে যায়। কিন্তু প্রতিভা চিনতে প্রতিভার দরকার—যেমন জহরৎ চেনে জহুরী। রামানুজনের প্রতিভাও ধরা পড়তো না, যদি সে-রকম যোগাযোগ না ঘটতো এবং তৎকালীন কেমব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডির নজরে না পড়তো। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় রামানুজনের কাজ বিদ্বৎসমাজ তথা গাণিতিক সমাজ সম্পূর্ণরূপে জানতে পারলো। অধ্যাপক হার্ডির সম্পাদনায় কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত রামানুজনের কাজের সংকলনটি এই সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য। রামানুজনের প্রতিভার অসাধারণত্ব গাণিতিকদের বিস্মিত করেছে।

ভারতের একটি দরিদ্র পরিবারের সন্তান কীভাবে স্বীয় প্রতিভা ও অধ্যবসায় বলে বিশ্বদরবারে উচ্চ সম্মান অর্জন করেছিলেন তার ইতিবৃত্ত প্রত্যেক ভারতবাসীর, বিশেষ করে কিশোর ও তরুণদের জানা দরকার। বাংলাভাষায় রামানুজনের সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ এবং প্রামাণিক কোন জীবন-গ্রন্থ নেই। স্নেহাস্পদ শ্রীরবীন বন্দ্যো-

পাধ্যায় এই শ্রমসাধ্য কাজটি সুসম্পন্ন করেছেন—উদ্দেশ্য, যাতে বাংলাভাষাভাষী কিশোর ও তরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় অভিজ্ঞ লেখক, তাঁর লেখার ভাষা এবং উপস্থাপনা অনবদ্য—সে বিষয়ে নতুন করে বলার দরকার করে না। বইখানি যে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে উপযুক্ত সমাদর পাবে সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নেই।

(ডঃ) সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়
[প্রাক্তন উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়



শ্রীনিবাস রামানুজন



রামানুজনের স্ত্রী শ্রীমতী জানকী দেবী



মাদ্রাজের কুম্ভকোনমে রামানুজনের পৈত্রিক আবাস

জন্ম-পরিচয়

পৃথিবীর সকল সংস্কৃতিশীল দেশেই কোনো-না-কোনো বিষয়ে দু' একজন প্রতিভাধর মানুষের আবির্ভাব সব সময়েই হয়ে থাকে। কিন্তু অনন্য-প্রতিভা মনীষীর আবির্ভাব কোনো দেশেই সচরাচর ঘটে না। তার জন্যে দেশ ও জাতিকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়, বহু সাধনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। বিশ্বের ইতিহাসে তার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ইংলণ্ডে আবির্ভাব হয়েছে একজন শেকস্‌পীয়ার ও একজন নিউটনেরই, জার্মেনীতে জন্মেছেন একজন গ্যেটে ও একজন আইনষ্টাইনই, ফ্রান্‌সে এসেছেন একজন গালোয়া ও একজন মাদাম কুরী, ইতালীতে জন্মেছেন একজন মাইকেল এঞ্জেলো ও একজন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, অ্যামেরিকায় আবির্ভাব হয়েছে একজন হুইটম্যান ও একজন উডওয়ার্ডের, রাশিয়ায় এসেছেন একজন টলস্টয় ও একজন লান্দাউ, আর ভারতে জন্মেছেন একজন রবীন্দ্রনাথ ও একজন রামানুজনই।

বিশ্বের অনন্য-প্রতিভার ইতিহাসে ভারতীয় গণিতবিদ্ শ্রীনিবাস রামানুজন সত্যিই এক পরম বিস্ময়। মাত্র ৩২ বছরের জীবনকালে তিনি গণিতে যে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার স্বর্ণ-স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার তুলনা বিরল। ফারমেট, পাস্‌ক্যাল, নিউটন, অয়লার, লাগরাঞ্জ, গাউস প্রমুখ বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞদের সঙ্গেই বোধ হয় সে প্রতিভার তুলনা করা চলে। অথচ প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের পক্ষে যে পরিণত জীবনকাল, পর্যাপ্ত শিক্ষা, আর্থিক সচ্ছলতা ও অনুকূল পরিবেশ একান্ত প্রয়োজন, তার কোনোটিই রামানুজনের ভাগ্যে জোটে নি। যে স্বল্প ক'টি বছর তিনি জীবিত

থেকে গণিত-সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তার অধিকাংশ সময়েই তাঁকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

রামানুজনের জীবন-কথা আলোচনা করতে গেলে তাই তাঁর অকাল প্রয়াণের আক্ষেপ আমাদের মনে বিশেষভাবে জেগে ওঠে। তাঁর জীবনাবসানে লণ্ডনের 'টাইমস' (Times) পত্রিকা যথার্থই লিখেছিলেন :

'There is something peculiarly sad in the spectacle of genius dying young, dying with the first sweets of recognition and success tasted, but before the full recognition of the powers that lie within.'

'প্রতিভাধর মনীষীর অকাল প্রয়াণের দৃশ্য একান্ত আক্ষেপের বিষয়। আক্ষেপ এজন্যে যে, কেবলমাত্র প্রথম স্বীকৃতি ও সাফল্যের আশ্বাস লাভ করেই তিনি চলে গেলেন, কিন্তু তাঁর অন্তর্নিহিত প্রতিভার পূর্ণ স্বীকৃতির সুযোগ ঘটলো না।'

রামানুজনের পুরো নাম শ্রীনিবাস রামানুজন আয়েঙ্গার। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) রাজ্যের তাঞ্জোর জেলার কুম্ভকোনম্ শহরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। প্রাচীন শহর কুম্ভকোনম্ মন্দিরের জন্যে বিখ্যাত। তাঁর বাবা কুপ্পুস্বামী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কুম্ভকোনমে এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকানে গোমস্তা বা হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন। তাঁর মা কোমলতা দেবী ছিলেন তাঞ্জোরের সন্নিহিত কোয়াম্বাটুর জেলার এরোদ শহরে মুন্সেফ কোর্টের জনৈক আমিন বা বেলিফের কন্যা। কাবেরী নদীর তীরবর্তী এরোদ একটি সমৃদ্ধিশালী শহর।

রামানুজন তাঁর মা-বাবার প্রথম সন্তান। বিয়ের কয়েক বছর পরেও তাঁদের কোনো সন্তান না হওয়ায় কোমলতা অত্যন্ত বিষণ্ণ

হয়ে পড়েন। রামনুজনের মাতামহ তাঁর কন্যার সন্তান কামনায় স্থানীয় পূজারীদের শরণাপন্ন হন। তাঁরা জানালেন, পাশের শহর নামকালে জাগ্রতা দেবী নামগিরির পূজার্চনা করলে তাঁদের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। সেই অনুযায়ী ধর্মপ্রাণা ভক্তিমতী কোমলতা দেবী নামগিরির পূজার্চনা করে প্রার্থনা জানালেন। কিছু কালের মধ্যেই তাঁর সে মনস্কামনা পূর্ণ হলো।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কোমলতা দেবী তাঁর প্রথম সন্তান প্রসবের জন্যে এরোদে পিতৃগৃহে গমন করেন। সেখানে সম্বৎ সর্বজিতের মার্গশীর্ষের নবমী তিথিতে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর তাঁদের জ্যেষ্ঠপুত্র রামানুজন ভূমিষ্ঠ হয়। দেবী নামগিরির আশীর্বাদে প্রথম পুত্রসন্তান হওয়ায় মাতামহ ও পিতামহ উভয়েরই পরিবারে পরম আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। তাঁর পিতা প্রথমেই ছুটলেন দেবী নামগিরির কাছে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পূজার্চনা করতে।

রামানুজনের পর তাঁদের আরও দুটি পুত্রসন্তান হয়। মধ্যম পুত্র লক্ষ্মীনরসিংহন এবং কনিষ্ঠ পুত্র তিরুনারায়ণন। রামানুজনের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে ছোট ভায়ের বয়সের তফাৎ ছিল ১৭ বছর।

রামানুজনের চেহারায় তার বাবার চেয়ে মায়ের আদলই ছিল বেশী এবং গায়ের রঙ ছিল ফর্সা। শিশু বয়সে বসন্ত হওয়ার দরুন তার মুখে কিছু কিছু দাগ ছিল। শিশু রামানুজনের চেহারায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না, যাতে তাকে আর পাঁচজন শিশুর থেকে অসাধারণ মনে হত। কিন্তু তার চোখ দুটি ছিল প্রখর উজ্জ্বল আর সে দুটি চোখের মধ্যেই তার ভবিষ্যৎ প্রতিভা ছিল অন্তর্নিহিত।

রামানুজনের মা ছিলেন ধর্মপ্রাণা ও ভক্তিমতী মহিলা। সে তার মা'র কাছ থেকে স্তোত্র পাঠ ও ভক্তিগীতি শিখেছিল এবং আধ্যাত্মিক স্পৃহা তার মনে সঞ্চারিত হয়েছিল। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে তার মা ও প্রতিবেশীদের শোনাত। বার বার পাঠ করে এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থ তার কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল। বেদ, উপনিষদ ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং

সাধুসন্তদের উপদেশ ও বাণী সে প্রায়ই স্মৃতি থেকে উদ্ধৃত করে শোনাত এবং যাঁরা শুনতেন তাঁরা রামানুজনের স্মৃতিশক্তি দেখে বিস্মিত হতেন।

রামানুজন ছিল শান্ত ও ভাবুক প্রকৃতির ছেলে। সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে সে বিশেষ খেলাধুলা করত না বা ঘুরে বেড়াত না। ভাবুক প্রকৃতির বলে সে নিঃসঙ্গতাই বেশী পছন্দ করত। বাড়ির বাইরে গিয়ে রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করা তার মা-বাবা পছন্দ করতেন না বলে সে বাড়িতেই বেশীর ভাগ সময় কাটাত।

বিচিত্র জিনিসের প্রতি রামানুজনের ছিল গভীর কৌতূহল এবং পথেঘাটে যে নাটক অভিনীত হত তা দেখবার প্রবল আকর্ষণ সে অনুভব করত। এজন্যে অনেক সময় সে এসব নাটকাভিনয় দেখবার জন্যে পাঁচ ছয় মাইল দূরেও পায়ে হেঁটে যেত।

রামানুজন ছিল সরল, অমায়িক ও বিনয়ী। যদিও সে নিঃসঙ্গতা পছন্দ করত, কিন্তু অপরের সঙ্গে কথাবার্তাও সে বলত। ছোটবেলা থেকেই সে অঙ্ক কষতে ভালবাসত। কিন্তু অঙ্ক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও সে আলোচনা করত। সে যে কত কৌতুকপ্রিয় ও সদালাপী ছিল তা এসব আলোচনায় প্রকাশ পেত।

ছাত্র-জীবন

রামানুজনের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তার বাবা তাকে কুম্ভকোনম্-এর স্থানীয় পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। এখানে সে তামিল অক্ষর ও প্রাথমিক গণিতের পরিচয় লাভ করে। অনেক সময় সে আকাশে তারার দিকে তাকিয়ে থাকত এবং পরের দিন ক্লাসে এসে গণিতের শিক্ষককে তারার আকার ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব সম্পর্কে নিগূঢ় সব প্রশ্ন করত। এই সব প্রশ্ন শুনে শিক্ষক যত না বিস্মিত হতেন, তার চেয়ে বেশি বিস্ময়াহত হত তার সহপাঠীরা। তারা রামানুজনকে গণিতে প্রাগ্রসর বলে মনে করত এবং যেসব জটিল গাণিতিক প্রশ্ন নিজেরা সমাধান করতে পারত না তা করে দেবার জন্যে তাকে বলত। সে খুশী মনে সেসব প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করত এবং করেও দিত। কখন কখন তারা দুষ্টুমি করে তাকে জটিল প্রশ্ন দিত। যখন সে সেই প্রশ্নের সমাধান বার করার জন্যে নিমগ্ন হয়ে যেত, তখন তারা তার ইজেরের ওপর পাথরের নুড়ি রেখে দিত। সমাধান বার করে যখন সে উঠে দাঁড়াত, তখন পাথরের নুড়িগুলি পড়ে যেত আর বন্ধুরা হেসে উঠত। এভাবে তারা রামানুজনকে ঠকিয়ে আনন্দ উপভোগ করত। কিন্তু রামানুজন এতে ভ্রূক্ষেপ করত না। যদি কেউ তাকে দুষ্টু সহপাঠীদের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করতে বলত, সে তাতে রাজী হত না, বরং মাথা নেড়ে অসম্মতিই জানাত। এর ফলে সে যেমন শিক্ষকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তেমনি সহপাঠীদের কাছে মর্যাদার পাত্র হয়ে ওঠে। এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রামানুজন ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত চার বছর শিক্ষালাভ করে। ১৮৯৭ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত

শেষ প্রাথমিক পরীক্ষায় রামানুজন সমগ্র তাঞ্জোর জেলার পরীক্ষার্থী-দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে। তখন তার বয়স দশ বছর।

ছোটবেলা থেকেই রামানুজনের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। যখন তার বয়স মাত্র ৬ বছর, তখন সে সংস্কৃত ব্যাকরণের আত্মনেপদী ও পরস্মৈপদী ধাতুরূপ নির্ভুলভাবে বলতে পারত এবং * 'পাই' (পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত)-এর মান ও ২-এর বর্গমূল বেশ কয়েকঘর দশমিক পর্যন্ত ঠিক ঠিক বলে দিত।

ছোটবেলায় ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ ভালবাসে খেলাধুলা করতে, কেউ ভালবাসে ছবি আঁকতে, কেউ ভালবাসে গান গাইতে, কেউ ভালবাসে গল্পের বই পড়তে, আবার কেউ বা ভালবাসে পড়া-শোনা করতে। কিন্তু সারাক্ষণ অঙ্ক কষতে ভালবাসে এমন ছেলের কথা কদাচিৎ শোনা যায়। রামানুজন ছিল এমনি এক অদ্ভুত ছেলে। সে ভালবাসত শুধু অঙ্ক কষতে আর অঙ্ক নিয়েই মেতে থাকত সবসময়।

১৮৯৮ সালে রামানুজন কুম্ভকোনমের টাউন হাইস্কুলে ভর্তি হয় এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্যে অর্ধবেতনে পড়বার সুযোগ পায়। স্কুলে ভর্তি হবার পর প্রতি বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে সে পুরস্কার পেত। যেসব বই তাকে পুরস্কার দেওয়া হত, সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধের বই। কিন্তু গল্প, উপন্যাস বা কবিতা পড়তে তার বিশেষ ভাল লাগত না। ক্লাসে বসে বেশির ভাগ সময়েই সে অঙ্ক কষত। অঙ্কে যে সে প্রতি বছরই ক্লাসের ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেত তা বলাই বাহুল্য।

রামানুজনের অঙ্ক কষার এই অদ্ভুত আকর্ষণ দেখে ক্লাসের মাস্টার মশাইরা তেমন গুরুত্ব দিতেন না (এদেশে যা সচরাচর ঘটে থাকে)। কিন্তু তার বন্ধুবান্ধবেরা এ-ব্যাপারে তাকে প্রচুর প্রেরণা যোগাত। তারা নানারকম অঙ্কের বই তার কাছে এনে দিত। সে-সব বই পেয়ে রামানুজনের আনন্দের সীমা থাকত না। জানা-অজানা সব রকম অঙ্কের প্রশ্ন নিয়ে সে মাথা ঘামাত। তার একটা অদ্ভুত

স্বভাব ছিল, অঙ্কের বই-এর কোনো অঙ্কই সে বই-এ যেভাবে কষে দেওয়া আছে, তা না দেখেই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে করবার চেষ্টা করত।

অঙ্ক সম্পর্কে রামানুজন ক্লাসে এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করত যে মাস্টারমশাইরা পর্যন্ত ভেবে তার কূলকিনারা পেতেন না। রামানুজন তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর (বর্তমান নবম শ্রেণী) ছাত্র। একদিন ক্লাসের অঙ্কের মাস্টারমশাই বললেন: 'যে কোনো সংখ্যাকে সেই একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে তার ফল হবে ১।'

মাস্টারমশাইয়ের এ-কথা শুনে রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করলো: '0-কে যদি 0 দিয়ে ভাগ করি তার ফলও কি ১ হবে?'

এমন অদ্ভুত প্রশ্ন মাস্টারমশাই এর আগে কোনো ছাত্রের কাছে কখনও শোনেন নি। রামানুজনের এই অদ্ভুত প্রশ্ন শুনে তিনি হক্‌চকিয়ে গেলেন! কি যে উত্তর দেবেন তা মনে মনে ভেবে ঠিক করতে পারলেন না। তাই রামানুজনের প্রশ্ন এড়িয়ে তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

গণিতের প্রতি রামানুজনের এই প্রগাঢ় আকর্ষণ মাস্টার মশাই-দের অদ্ভুত মনে হলেও তাঁরা তার গণিতমেধা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই স্কুলে শিক্ষকদের টাইম-টেবিল প্রস্তুত করার দায়িত্ব প্রধান শিক্ষক মশাই যখন প্রধান গণিত-শিক্ষক শ্রীগণপতি সুব্বাইয়ার ওপর অর্পণ করতেন, তখন শ্রীসুব্বাইয়া তরুণ রামানুজনকে ডেকে এই জটিল কাজটি করে দিতে বলতেন। রামানুজন সানন্দে এই কাজের দায়িত্ব নিত। স্কুলে শিক্ষকরা ছিলেন তিরিশ জন এবং ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় পনেরো শো। রামানুজন এই জটিল কাজটা এমন সুন্দরভাবে সমাধান করত যে, কোনো শিক্ষকই অতিরিক্ত ক্লাস দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করতেন না, অথচ প্রত্যেককেই ক্লাস দেওয়া হত।

স্কুলের শেষ বার্ষিক পরীক্ষায় গণিত বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্যে রামানুজনকে 'রঙ্গনাথ রাও' পুরস্কার দেওয়া হয়। স্কুলের পুরস্কার-

বিতরণী সভায় প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ আয়ার অনুষ্ঠানের সভাপতি ভি. কৃষ্ণস্বামী আয়ার ও সমবেত শ্রোতাদের কাছে রামানুজনের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন : 'এই ছাত্রটি গণিত বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছে এবং আমাদের গণিত শিক্ষকের মতে সর্বোচ্চ নম্বরের চেয়েও বেশি নম্বর পাবার সে যোগ্য।' রামানুজনের অনন্য গণিতপ্রতিভার এই হলো প্রথম স্বীকৃতি।

১৯০৩ সালে কুম্ভকোনমের টাউন হাইস্কুল থেকে রামানুজম প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এরপর রামানুজন কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে এফ.এ. (আগেরকার আই. এ.) ক্লাসে ভর্তি হয়। কলেজে গণিত ও ইংরেজি রচনা বিষয়ে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে রামানুজন একটি জুনিয়র বৃত্তি লাভ করে। কলেজে তার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ইংরেজি, গণিত, শারীরতত্ত্ব, রোমান ও গ্রীক ইতিহাস এবং ভারতীয় ভাষা হিসাবে সংস্কৃত।

শারীরতত্ত্ব বিষয়টি রামানুজনের একবারেই ভালো লাগত না, বরং এই বিষয়টির প্রতি তার একটা বিশেষ ভীতি ছিল। প্র্যাকটি-ক্যাল ক্লাসে ব্যাঙ ব্যবচ্ছেদ করতে সে মোটেই চাইত না। একদিন প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ক্লোরোফরম দিয়ে ব্যাঙ মারবার সময় সে শিক্ষক মশাইকে জিজ্ঞেস করেছিল : 'স্যার, আমরা মানুষেরা কূপমণ্ডুক বলেই কি সমুদ্রের ব্যাঙকে ব্যবচ্ছেদের জন্যে বেছে নেওয়া হয়?'

আর একবার ক্লাসে শারীরতত্ত্ব বিষয়ের পরীক্ষায় পাচনতন্ত্র সম্পর্কে একটি প্রশ্ন ছিল। রামানুজন তার উত্তরপত্রে পাচনতন্ত্র সম্পর্কে কিছু না লিখে শুধু কয়েকটি বাক্য সংযোজন করেছিল : 'স্যার, পাচনতন্ত্র বিষয়ে আমি কিছুই হজম করতে পারি নি। তাই শুধু সাদা খাতাই পেশ করলুম।' ইচ্ছে করেই সে উত্তরপত্রে তার নাম লেখে নি।

কিন্তু নামহীন খাতাটি যে কার তা বুঝতে ক্লাসের শিক্ষক

মশাইয়ের অসুবিধা হয় নি। তিনি ক্লাসে এসে রামানুজনকে জিজ্ঞেস করলেন : 'এই সাদা খাতাটি কি তোমার ?'

রামানুজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো : 'হাঁ, স্যার।'

—'কিন্তু খাতায় তো তুমি নাম লেখো নি ?'

—'স্যার, আমি অপরাধ স্বীকার করছি।'

এরপর শিক্ষকমশাই রামানুজনকে আর কিছু বলেন নি।

কলেজে রামানুজন সাধারণত কালো কালিকট চেকের কোট ও লাল রঙের উলের টুপি পরে আসত (তখন টুপি পরে ক্লাসে আসাই ছিল নিয়ম)।

একদিন সে খালি মাথায় সংস্কৃত ক্লাসে এসে ঢুকলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক তাকে খালি মাথায় দেখে চটে গিয়ে বললেন : 'তুমি টুপি পরে আসো নি কেন ?'

লজ্জিত হয়ে রামানুজন বললো, 'স্যার, আমি টুপি পরে যখন ট্রামে উঠতে যাচ্ছিলুম, তখন দমকা বাতাসে আমার টুপিটা উড়ে গেল।'

—'তা হলে দোকান থেকে আর একটা টুপি কিনে আনো।'

—'কিন্তু আর একটা টুপি কেনবার পয়সা আমার নেই, স্যার।'

—'দাম তো মাত্র আট আনা।'

—'তা ঠিকই স্যার, কিন্তু সে পয়সাও আমার নেই। আমাকে খালি মাথায় ক্লাস করবার অনুমতি দিন, স্যার।' বলতে বলতে রামানুজনের চোখ ছল-ছলিয়ে উঠলো।

রামানুজনের এই কথা শুনে পণ্ডিত মশাই বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং আর কিছু বললেন না তাকে।

কলেজ জীবনে প্রবেশ করবার পর থেকে গণিতের প্রতি রামানুজনের অস্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পায়। কলেজে ক্লাসে সবসময় সে গণিতচর্চায় নিমগ্ন থাকত। অন্যান্য বিষয়ের প্রতি সে যথোচিত নজর দিত না। ফলে কলেজে প্রথম বার্ষিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে কম নম্বর পাওয়ায় সিনিয়র এফ.এ. ক্লাসে সে উন্নীত হতে পারলো

না এবং তার বৃত্তিও কাটা গেল। এতে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে সে অন্য কলেজে ভর্তি হবার কথা ভাবতে লাগলো। মা-বাবার কাছে আর্থিক সাহায্য চাইবার মতো মুখ নেই তার। কিন্তু কি করবে সে? তার এক বন্ধু পরামর্শ দিল: 'ভিজাগাপট্টনম্-এ যাও, সেখানে সুযোগ-সুবিধা পেতে পার।'

বন্ধুর পরামর্শ মতো রামানুজন ভিজাগাপট্টনম্-এ গেল। কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা পেল না। বাধ্য হয়ে আবার মাদ্রাজে ফিরে আসতে হলো। ফিরে এসে অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর সেখানকার সুপ্রসিদ্ধ পচাইআপ্পা কলেজে জুনিয়র এফ.এ. ক্লাসে সে ভর্তি হলো। কলেজের অধ্যক্ষ জে.এ. ইয়েটস্ গণিতে রামানুজনের অসাধারণ পারদর্শিতার কথা জানতে পেরে তাকে অর্ধ-বেতনে পড়বার সুযোগ করে দিলেন।

কলেজে ক্লাসে রামানুজন সাধারণত সবশেষ গ্যালারীর এক কোণে গিয়ে বসত এবং তার নিজের গণিতচর্চা নিয়ে বিভোর থাকত। ক্লাসে কি বিষয় পড়ানো হচ্ছে সেদিকে সে ভ্রূক্ষেপ করত না।

তার কলেজ-জীবনের এক সহপাঠী সি. আর. কৃষ্ণস্বামী আয়ার-এর কথায় জানা যায়: 'আমাদের গণিত-অধ্যাপক রামানুজাচারিয়ার ক্লাসে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্ক কষতে কষতে কখনও কখনও রামানুজনকে ডাক দিতেন অঙ্কটা শেষ করবার জন্যে। তখন সে দাঁড়িয়ে উঠে সাহসের সঙ্গে বলত: স্যার, আপনি মাঝের যে কয়েকটি ধাপ লিখেছেন তা বাদ দিলেও চলে। বলে সে অঙ্কের শেষ ধাপ বোর্ডে লিখে সমাধান করে দিত। এতে তার সহপাঠীরা যত না বিস্মিত হত, তার চেয়ে বেশি বিস্মিত হতেন স্বয়ং অধ্যাপক মশাই।

তিনি রামানুজনকে বলতেন: 'কিভাবে তুমি এই শেষ ধাপে উপনীত হলে তা ব্যাখ্যা করে দেখাও।'

রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিত।

পচাইআপ্পা কলেজে পড়বার কিছু কাল পরে রামানুজন অসুস্থ হয়ে পড়ে। ফলে তার কলেজে পড়ার ছেদ ঘটে। কুম্ভকোনমে

মা-বাবার কাছে তাকে ফিরে আসতে হয়। শরীর সুস্থ হবার পর বাবা তাকে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী-রূপে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে বললেন। সেই অনুসারে ১৯০৭ সালের ডিসেম্বরে রামানুজন প্রাইভেটে এফ. এ. পরীক্ষা দিল। কিন্তু বিধি বাম। গণিতে ১০০-র মধ্যে ১০০ নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও অন্য বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় পরীক্ষায় সে কৃতকার্য হতে পারলো না। এখানেই অপ্রত্যাশিত-ভাবে তার ছাত্রজীবনের যবনিকাপাত ঘটলো। কলেজের শিক্ষা আর সম্পূর্ণ হলো না। শুরু হলো তার কঠোর জীবন-সংগ্রাম।

জীবন-সংগ্রাম

এফ. এ. পরীক্ষায় রামানুজনের অকৃতকার্যতায় এবং তার গণিত-চর্চার 'পাগলামি'-তে হতাশ হয়ে মা-বাবা তার বিবাহ দেওয়া স্থির করলেন, যাতে ছেলের মতিগতি পাল্‌টায় ও অর্থোপার্জনে সচেষ্ট হয়। ১৯০৯ সালের গোড়ার দিকে শ্রীমতী জানকী দেবীর সঙ্গে রামানুজনের বিবাহ দেওয়া হলো। তখন রামানুজনের বয়স ২২ বছর, আর তার স্ত্রীর বয়স মাত্র ৯ বছর। জানকী দেবীর বয়স অল্প হওয়ায় তিনি কুম্ভকোনমে কয়েক মাস কাটিয়ে মা-বাবার কাছে ফিরে যেতেন। কিন্তু ১৯১৩ সালের পর থেকে রামানুজন মাদ্রাজ শহরের জর্জ টাউন অঞ্চলে একটি বাড়ি ভাড়া করে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে বাস করতে থাকেন। বিবাহ রামানুজনের জীবনে একটি পরিবর্তন আনলো। তিনি উপলব্ধি করলেন, এখন আর মা-বাবার ওপর ভারস্বরূপ হয়ে তাঁর থাকা উচিত নয়। তিনি সংকল্প করলেন. এবার থেকে তাঁকে নিজের জীবিকা অর্জন করতে হবে।

জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় রামানুজন প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু দরিদ্র পরিবারের সন্তান যিনি, শিক্ষাজীবন যাঁর উজ্জ্বল নয় এবং যাঁর কোনো মুরুব্বি নেই তাঁর পক্ষে জীবিকার্জনের পথ খুঁজে পাওয়া তো সহজ নয়!

রামানুজন বিবাহ করবার প্রায় দু বছর আগে অর্থাৎ ১৯০৭ সালে অধ্যাপক ভি. রামস্বামী আয়ার ভারতীয় গণিত সমিতি (Indian Mathematical Society) প্রতিষ্ঠা করেন। রামানুজন ভাবলেন, অধ্যাপক আয়ারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর গণিত

বিষয়ক মৌলিক কাজগুলি তাঁকে দেখাবেন এবং একটা চাকরির জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানাবেন। বিশ্বস্ত সূত্রে রামানুজন জানতে পারেন, অধ্যাপক আয়ার তখন দক্ষিণ আরকট জেলার সাব-ডিভিশন শহর তিরুকোলারে ডেপুটি কালেক্টর পদে অধিষ্ঠিত। অধ্যাপক রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ১৯১০ সালে তিনি কুম্ভকোনম্ থেকে ট্রেনযোগে যাত্রা করেন, তারপর ভিল্লুপুরমে শেষ ট্রেন বদলে তিরুকোলারে উপস্থিত হন। সেখানে অধ্যাপক আয়ারের সঙ্গে তিনি দেখা করতে যান। অধ্যাপক আয়ারের সঙ্গে তাঁর যে কথোপকথন হয়, তার এক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায় অধ্যাপক এস. আর. রঙ্গনাথনের প্রতিবেদনে:

রামানুজন: স্যার, আমি গণিতানুরাগী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

রামস্বামী আয়ার: তাই নাকি? ভেতরে এসো, বসো। গণিত বিষয়ে তুমি এ পর্যন্ত কি কাজ করেছ?

রামানুজন: আমার এই নোট-বই-এ আমি যেসব উপপাদ্য ও তার সমাধান বার করেছি তার কিছু কিছু আছে। এটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন আমি কি করেছি।

রামস্বামী আয়ার: আচ্ছা, খাতাটা দাও তো। অধিকাংশই দেখছি নতুন জিনিস। খুব ভালো কথা! যে পাতাই ওল্টাচ্ছি, দেখছি নতুন নতুন উপপাদ্য ও সূত্রে ভরা। এ সব কাজ তোমার! তুমি কোথায় কাজ কর?

রামানুজন: স্যার, আমি বেকার।

রামস্বামী আয়ার: (নোট-বই-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) তোমার মা-বাবার আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট ভালোই মনে হয়।

রামানুজন: না স্যার, আমি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। আমার বাবা কুম্ভকোনমে একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ীর দোকানে সামান্য করণিক মাত্র। এছাড়া, গত বছর মা-বাবা আমার বিবাহ দিয়েছেন।

রামস্বামী আয়ার : (রামানুজনের নোট-বই-এ তখনও নিমগ্ন থেকে) তাই নাকি ?

রামানুজন : স্যার, অনুগ্রহ করে আপনার অফিসে বা তালুক বোর্ডের অফিসে আমাকে একটা করণিকের চাকরি দিন। আমি তা হলে জীবিকা অর্জন করতে পারি।

রামস্বামী আয়ার : না, না, সেটা ভালো হবে না। তুমি যদি এই ছটোর যে কোনো অফিসে করণিকের কাজ কর, তা হলে তোমার গণিত-প্রতিভার বিকাশ ঘটবে না। আমি সেটা হতে দিয়ে তোমার কাছে অপরাধের ভাগী হতে চাই না।

রামানুজন : এমন কথা বলবেন না, স্যার। আপনি ছাড়া কে আর আমাকে সাহায্য করবে ?

রামস্বামী আয়ার : ভেবো না যেন আমি তোমাকে কৃতার্থ করতে চাইছি। তুমি সত্যিই কিছু সাহায্য পাবে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা কর। (তারপর রামস্বামী আয়ার তাঁর অফিস-ঘরে গিয়ে অধ্যাপক পি. ভি. শেশু আয়ারের নামে রামানুজনের কাজের জন্যে সুপারিশ করে একটি চিঠি লিখলেন)। রামানুজন, এই চিঠিটা নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক শেশু আয়ারের সঙ্গে দেখা কর। তুমি কি তাঁকে চেন ?

রামানুজন : হ্যাঁ স্যার, কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে আমি তাঁর ছাত্র ছিলুম।

রামস্বামী আয়ার : তা হলে তো তাঁর সঙ্গে দেখা করা তোমার পক্ষে সহজই হবে।

অধ্যাপক ভি. রামস্বামী আয়ারের চিঠি নিয়ে রামানুজন মাদ্রাজে গিয়ে অধ্যাপক শেশু আয়ারের সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি রামানুজনকে চিনতে পারলেন এবং শীঘ্রই তার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানালেন। প্রসন্ন মনে রামানুজন বাড়িতে ফিরে এলেন।

কয়েকদিন পরে অধ্যাপক শেশু আয়ার রামানুজনকে ডেকে পাঠালেন। রামানুজন দেখা করতে বললেন: মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল অফিসে তোমার জন্যে একটা কাজের ব্যবস্থা করেছি।

কিন্তু এই চাকরিটা ছিল সাময়িক ছুটির বদলী চাকরি। তাই কয়েক মাস কাজ করার পর রামানুজনকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হলো। তিনি আবার বেকার হয়ে পড়লেন এবং অত্যন্ত মনমরা হয়ে গেলেন।

এই সময় রামানুজন এক চরম সংকটের মধ্যে পড়েন। কি করে যে তাঁর নিজের ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণ চালাবেন তা ভেবে কূল-কিনারা পেলেন না। অনেক সময় সারাদিন অভুক্ত হয়ে তাঁদের থাকতে হত। ভাবনায় চিন্তায় ও উপযুক্ত পুষ্টির অভাবে রামানুজন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে বাড়িতে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে বাস করতেন, সেই বাড়ির মালিক তাঁর এই অসুস্থ, অভুক্ত ও নিঃসঙ্গ ভাড়াটের শোচনীয় অবস্থা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—যদি কিছু বিপর্যয় ঘটে যায়! তারপর যা ঘটলো তার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ আমরা পাই রামানুজনের বন্ধু ও সহপাঠী রাধাকৃষ্ণ আয়ারের লিখিত প্রতিবেদনে। রাধাকৃষ্ণ লিখছেন:

'বাড়িওয়ালা চাইছিলেন রামানুজন তাঁর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থাকুক। আকারে-ইঙ্গিতে সেটা বুঝতে পেরে রামানুজন বাড়ি ছেড়ে দিতে মনস্থ করে। একদিন আমি কলেজে যাবার জন্যে তৈরী হচ্ছি, এমন সময় দেখি একটা ঘোড়া-গাড়িতে করে অসুস্থ রামানুজন আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত। তার শারীরিক অবস্থা দেখে আমি বিচলিত হয়ে পড়ি। তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে আমার বিছানায় শুইয়ে দিই। কলেজে যাবার আগে আমার রাঁধুনীকে বলে যাই, সে যেন রামানুজনের সেবা-শুশ্রূষা করে। কলেজ থেকে ফিরে আমাদের পরিচিত চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণস্বামীকে ডেকে আনি। তিনি রামানুজনকে পরীক্ষা

করে আমাকে বললেন: রোগীর যা অবস্থা তাতে এর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া ভালো, কারণ অবিরাম সেবাশুশ্রূষা করা দরকার।

'চিকিৎসকের পরামর্শ মতো আমি রামানুজনকে নিয়ে বীচ রেলওয়ে স্টেশনে যাই এবং সেখানে আমার বন্ধু আর. এম. এস.-এর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট-এর তত্ত্বাবধানে তাকে ট্রেনে তুলে দিই। কুম্ভ-কোনম্ অভিমুখে ট্রেন ছাড়বার আগে রামানুজন তার দুখানা বড় খাতা আমাকে দিয়ে বলে, আমি যেন খাতা দুখানা যত্ন করে রাখি। খাতা দুখানায় দেখেছিলুম, খুব ঘন করে গাণিতিক বিষয় তাতে লেখা। আমি তার কিছুই বুঝতে পারি নি (পরবর্তীকালে জেনে-ছিলুম এ দুখানা খাতায় ছিল তার অনন্য গণিতপ্রতিভার ফসল)। খাতা দেবার সময় রামানুজন আমাকে কি সব কথা বলেছিল তা আজ আমার স্মরণে নেই। কিন্তু সেসময় তার চোখ দুটি যে সজল হয়ে উঠেছিল তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আর মনে আছে শেষ দিকে সে বলেছিল: আমি যদি মরে যাই, তা হলে এই খাতা দুখানা অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র অথবা মাদ্রাজ ক্রিশ্চান কলেজের ব্রিটিশ অধ্যাপক এডওয়ার্ড রসকে দিও।

'আমার পরম সৌভাগ্য যে, ঈশ্বরের আশীর্বাদে রামানুজন সুস্থ হয়ে তার এই মহামূল্যবান খাতা দুখানা পরে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিল।'

কয়েক মাস পরে আরোগ্য লাভ করে রামানুজন মাদ্রাজে ফিরে এলেন এবং চাকরির সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু বিধি বাম! কোথাও কোনো আশার আলো দেখতে পেলেন না। বাধ্য হয়ে তিনি প্রাইভেট টিউশনি শুরু করলেন।

রামানুজনের এই ব্যক্তিগত শিক্ষকতার কিছু কিছু কথা তাঁর দুএকজন ছাত্রের প্রতিবেদনে জানা যায়। তাঁর এক ছাত্র কে. এস. বিশ্বনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: 'আমার বাবা আমার গণিত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে রামানুজনকে মাসে ৭ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন।

তিনি প্রতিদিন সকালে আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে বীজগণিত, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। সাধারণ শিক্ষকদের মতো তিনি ধাপে ধাপে অঙ্ক শেখাতেন না, তাঁর নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতিতেই অঙ্ক শেখাতেন। কখনও কখন আমি যখন তাঁর কষে-দেওয়া অঙ্কের সমাধান মনে রাখতে পারতুম না, তখন তিনি আবার এক নতুন সহজতর পদ্ধতিতে অঙ্কটি কষে দিতেন। এ থেকেই বোঝা যায়, গণিতে তাঁর মৌলিকত্ব কতখানি ছিল। দু বৎসর কাল তাঁর কাছে গণিত বিষয়ে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। গণিত-বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি ছাত্রমহলে সুপরিচিত ছিলেন। এজন্যে পরীক্ষার সময় ছাত্ররা তাঁর শরণাপন্ন হত। অনেক সময় দেখা যেত, কাবেরী নদীর বালুবেলায় বসে তিনি ছাত্রদের দেখিয়ে দিচ্ছেন পরীক্ষায় কি ধরনের অঙ্ক আসতে পারে।'

রামানুজনের আর একজন ছাত্র কে. নরসিংহ আয়েঙ্গার তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন: '১৯১১-১২ সালে রামানুজন আমাদের পরিবারের সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করতেন। সে সময় আমি ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। আমি ছিলুম অঙ্কে ভীষণ কাঁচা। তখন রামানুজনের কাছে গণিতে শিক্ষালাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং তাঁর সাহায্য ছাড়া আমি অঙ্কে পাস করতে পারতুম না। অঙ্ক পরীক্ষার দিন তিনি আমাদের বাড়ি থেকে চার মাইল দূরে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আমাকে উৎসাহিত করেন। সকালের প্রশ্নপত্রে ভালোভাবে উত্তর দিতে না পারায় আমি বিকেলের পরীক্ষায় বসতে ইতস্ততঃ করছিলুম। তিনি আমাকে হতাশা ত্যাগ করে পরীক্ষায় বসতে অনুপ্রাণিত করলেন এবং শেষ মুহূর্তে এমন কয়েকটি কায়দা শিখিয়ে দিলেন যে, যাতে আমি গণিতে ৩৫% নম্বর সংগ্রহ করতে পারলুম। একথা আজ অকপটে স্বীকার করি, রামানুজনের সাহায্য ছাড়া আমার পক্ষে কোনোক্রমেই অঙ্কে পাস নম্বর তোলা সম্ভব হত না।'

কয়েকজন ছাত্রকে পড়িয়ে রামানুজন কোনোক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন

করছেন জানতে পেরে অধ্যাপক শেশু আয়ার অত্যন্ত বিচলিত হন। তিনি রামানুজনকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁকে নেলোর (মাদ্রাজ থেকে ১৭৬ কিলোমিটার দূরে) জেলার কালেক্টর দেওয়ান বাহাদুর রামচন্দ্র রাও-র সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামচন্দ্র রাও ছিলেন গণিতের গভীর অনুরাগী।

১৯১০ সালের ডিসেম্বরে রামচন্দ্র রাও-এর সঙ্গে রামানুজন দেখা করতে গেলেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে রামচন্দ্র রাও তাঁর লিখিত প্রতিবেদনে বলেছেন:

'আমার এক ভাইপো (গণিত সম্পর্কে যার কোনো ধারণাই ছিল না) একদিন এসে বললো, কাকা, একজন গণিত-পাগল লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। সে অনর্গল গণিত-বিষয়ে কথাবার্তা বলছে—যার মাথামুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। আপনি একবার দেখবেন, তার কথায় কোনো সারবত্তা আছে কিনা।

'গণিত সম্পর্কে আমার জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে পারলুম, লোকটির মধ্যে কিছু অভিনবত্ব আছে। তাই ভাইপোকে বললুম লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আনতে।

'খর্বকায়, মুখে গোঁফদাড়িভরা, অপরিচ্ছন্ন পোশাক-পরা একজন লোক এসে আমার ঘরে ঢুকলো। তার চেহারা ও সাজপোশাক দেখে বুঝলুম, লোকটি খুবই দরিদ্র। কিন্তু তার উজ্জ্বল চোখ দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ না করে যায় না।

'সে বললে, গণিতচর্চার সুযোগ পাবার জন্যে সে কুম্ভকোনম থেকে মাদ্রাজে এসেছে। সে কোনো মান-সম্মান চায় না। সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় শুধু সে পেতে চায়, যাতে মনের আনন্দে গণিতচর্চা সে করে যেতে পারে।

'খাতা খুলে তার উদ্ভাবিত কয়েকটি গণিত-পদ্ধতি সে আমাকে ব্যাখ্যা করে দেখাল। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম, তার কাজের মধ্যে অভিনবত্ব আছে। কিন্তু গণিতে আমার যা জ্ঞান তাতে ঠিক বুঝে উঠতে পারলুম না—সে যা বলছে সেটা নিছক পাগলের

প্রলাপ, না তার মধ্যে কোনো সারবস্তু আছে। তার কাজ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে আমি তাকে আর একদিন আসতে বললুম। সেই অনুযায়ী রামানুজন আর একদিন আমার কাছে এলো। সেদিনও তার খাতাপত্র নাড়াচাড়া করতে দেখে আমার অজ্ঞতা সে বোধ হয় আঁচ করতে পারলো। তাই তার উদ্ভাবিত কয়েকটা সহজতর পদ্ধতি সে আমাকে দেখাল। আগে সে যা দেখিয়েছিল তার চেয়ে এগুলি আরও বিস্ময়কর। বুঝতে পারলুম, রামানুজন একজন অসাধারণ গণিতজ্ঞ। তারপর ধাপে ধাপে তার কাজের গভীরে প্রবেশ করে মুগ্ধ হয়ে গেলুম। জানতে চাইলুম—আমার কাছে সে কি সাহায্য চায়?

'রামানুজন বললে, জীবিকা নির্বাহের জন্যে সে যৎসামান্য অর্থোপার্জন করতে চায়, যাতে আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে গণিত বিষয়ে গবেষণার কাজ সে চালিয়ে যেতে পারে।'

রামানুজনের কথা শুনে রামচন্দ্র রাও ভাবলেন নেলোরের মতো মফঃস্বল শহরে আটকে রাখলে রামানুজনের প্রতিভার প্রতি অবিচার করা হবে এবং কোনো অফিসে করণিকের কাজ করে তার জীবনই নষ্ট হবে যাবে। তাই তিনি রামানুজনের জন্যে একটা বৃত্তি সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং সেটা না পারলে অন্য কোনো সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবেনই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে দেওয়ান বাহাদুর তাকে মাসে ২৫ টাকা করে পাঠাতে লাগলেন।

কিন্তু রামানুজনের মতো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে কারো ব্যক্তিগত দানের ওপর নির্ভর করে বাঁচা সম্ভব নয়। তাই সে বেশি দিন এই দান গ্রহণে সম্মত হলো না।

রামানুজনের এই মনোভাবের প্রশংসা করে অধ্যাপক শেশু আয়ার ও অধ্যাপক রামস্বামী আয়ার উভয়েই তাকে সাহায্য করবার জন্যে এগিয়ে এলেন। অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর অবশেষে মাদ্রাজে পোর্ট ট্রাস্টের ম্যানেজার তাঁদের বন্ধু এস. নারায়ণ আয়ারকে

বলে-কয়ে ট্রাস্ট অফিসে রামানুজনের জন্যে একটা করণিকের কাজের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হলেন। নারায়ণ আয়ার ছিলেন ভারতীয় গণিত সমিতির কোষাধ্যক্ষ। রামানুজনের গণিত-প্রতিভা সম্পর্কে তিনি আগেই অনেক কিছু শুনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকটি উপপাদ্য নিয়ে কাজও করেছিলেন।

১৯১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি রামানুজন মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চীফ অ্যাকাউনটেন্ট-এর কাছে করণিক-পদের জন্যে তাঁর আবেদনপত্র পেশ করলেন। তাঁর আবেদন সুপারিশ করে অফিস কর্তৃপক্ষ মন্তব্য করেন: 'ম্যানেজার তাঁকে (রামানুজনকে) গণিত-প্রতিভা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। মিঃ মিডলমাস্ট তাঁর সম্পর্কে বলেছেন গণিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। আবেদন মঞ্জুরীকৃত হলো।'

সেদিনই পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে রামানুজনের নিয়োগ সম্পর্কিত নির্দেশ প্রকাশিত হলো:

'শ্রীনিবাস রামানুজনকে জানানো হচ্ছে, তাঁর ১৯১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের আবেদন অনুযায়ী পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান তাঁর অফিসে মাসিক ২৫ টাকা বেতনে তাঁকে করণিকপদে নিয়োগ করছেন। ১৯১২ সালের পয়লা মার্চ থেকে তাঁকে কাজে যোগদানের জন্যে বলা হচ্ছে।'

এই চাকরি পেয়ে রামানুজন দীর্ঘদিন সংগ্রামের পর সুখের আলো দেখতে পেলেন, তাঁর মনে স্বস্তিও এলো। এখন তিনি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবেন, নিজের পরিবারের ভরণপোষণ নিজেই করতে পারবেন এবং উদ্বেগ ও অভাব-মুক্ত হয়ে তাঁর গণিত-চর্চা চালিয়ে যেতে পারবেন।

ইতিমধ্যে গণিত বিষয়ে রামানুজনের একটি গবেষণাপত্র (প্রশ্নাকারে) ভারতীয় গণিত সমিতির মুখপত্রে প্রকাশের জন্যে অধ্যাপক শেশু আয়ার প্রেরণ করেন এবং সেটি ১৯১১ সালে পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকারই ডিসেম্বর সংখ্যায় রামানুজনের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাপত্র (Some

properties of Bernoulli's Numbers) প্রকাশিত হয়। ১৯১২ সালে তাঁর আরও দুটি গবেষণাপত্র প্রকাশ পায়।

মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সার ফ্রান্সিস্ স্প্রীং (Sir Francis Spring) ছিলেন গণিতজ্ঞ ও গণিতানুরাগী। তিনি রামানুজনের গণিতচর্চা সম্পর্কে খবরাখবর রাখতেন এবং তাঁর প্রতি উৎসাহব্যঞ্জক সহানুভূতিও ছিল।

একদিন একটি ফাইল তাঁর কাছে স্বাক্ষরের জন্যে এলো। ফাইলটি দেখতে দেখতে তিনি তার মধ্যে কতকগুলো টুকরো কাগজ পেলেন, যাতে উপবৃত্তীয় পূর্ণসংখ্যা (elliptic integrals) সম্পর্কিত কিছু ফলাফল লেখা রয়েছে। তিনি পোর্টের ম্যানেজার নারায়ণ আয়ারকে ডেকে পাঠালেন। শ্রীআয়ার তাঁর কাছে এলে তিনি রাগের ভান করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: 'আপনি কি আজকাল অফিসে কাজের সময় ব্যক্তিগত গণিতচর্চা নিয়ে মেতে থাকেন?'

নারায়ণ আয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: না সার, আমি তো তা কখনই করি না।

'—তা হলে এগুলো কি? এই কাগজগুলো দেখুন'—সার ফ্রানসিস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ছাড়া আর কেউ তো আমাদের অফিসে এসব গণিত বিষয়ে মাথা ঘামায় না।'

'—সার, এটা আমার হাতের লেখাই নয়।'

'—তা হলে আর কে উচ্চগণিত নিয়ে আঁকজোক কাটে?'

'—সার, আমাদের অফিসে সদ্য-নিযুক্ত শ্রীনিবাস রামানুজনের কথা আপনি হয়তো জানেন, এটি তাঁরই কাজ মনে হয়।'

সার ফ্রানসিস্ হেসে বললেন: 'তা আমি জানি। আমি শুধু আপনাকে একটু বিব্রত করবার জন্যে এসব কথা বলেছি।'

সাধক কবি রামপ্রসাদ যেমন হিসাবের খাতা লিখতে গিয়ে তাতে শ্যামা মায়ের বন্দনাগান লিখে পাতার পর পাতা ভরিয়ে দিতেন, রামানুজনও তেমনি পোর্ট ট্রাস্টের কাগজপত্র লিখতে

লিখতে অসতর্ক মুহূর্তে নিজের গণিতচর্চার ফলাফল লিখে ফেলতেন (গণিতচর্চা নিয়ে তিনি সারাক্ষণ এতই বিভোর হয়ে থাকতেন)।

পোর্ট ট্রাস্টে কাজ পেয়ে রামানুজনের আর্থিক দিক থেকে কিছুটা সাশ্রয় হলেও সব প্রয়োজন তাতে মিটত না। স্ত্রী ছাড়া তাঁর মা ও ঠাকুমাও থাকতেন তাঁর সঙ্গে। এজন্যে তাঁর অতিরিক্ত খরচ হত। তাই অফিসের কাজের পর কলেজের ছাত্রদের পড়িয়ে তিনি অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করতেন।

একদিন তাঁর এক বন্ধু মাদ্রাজ বন্দরে বেড়াতে বেড়াতে দেখতে পেলেন, রামানুজন মাটিতে ফেলে-দেওয়া কাগজ কুড়োচ্ছেন। তিনি রামানুজনকে জিজ্ঞেস করলেন: 'তুমি ফেলে-দেওয়া কাগজের টুকরো কুড়োচ্ছ কেন?'

রামানুজন বললেন: 'ভাই, আমার গণিতচর্চার জন্যে কাগজের দরকার। কিন্তু আমার তো তেমন সামর্থ্য নেই যে কাগজ কিনে লিখি।'

এ কথা শুনে বন্ধুটি লজ্জিত হয়ে পড়লেন, আর কিছু বললেন না।

আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধা সত্ত্বেও রামানুজন কখনও মেজাজ খারাপ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল। তিনি যখন মাদ্রাজে ত্রিপ্লিকেন অঞ্চলে থাকতেন, তখন একদিন রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের রহস্য সম্পর্কে অনর্গল কথা বলছিলেন। এমন সময় ওপরের এক বাড়ি থেকে একজন লোক তাঁর মাথায় জল ঢেলে দিল। উদ্দেশ্য—এসব বক-বকানি থামাও। এতে রামানুজন বিন্দুমাত্র না চটে, হাসতে হাসতে বললেন: 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ আমার গঙ্গাস্নান হয়ে গেল। ভবিষ্যতে আরও যদি গঙ্গাস্নান হয় তো খুবই খুশী হব।'

এই প্রসঙ্গে মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। একবার তাঁর এক পরিচারিকা ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে গণিতচর্চার কিছু দরকারী কাগজপত্র 'বাজে কাগজ'

ভেবে রাস্তার আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়। নিউটন পরে ব্যাপারটা জানতে পেরে পরিচারিকাকে ভর্ৎসনা না করে শুধু বললেন: 'কাগজগুলো ফেলার আগে আমাকে একবার দেখিয়ে নিলে পারতে।'

পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করবার সঙ্গে সঙ্গে রামানুজন একাগ্রভাবে ও নিবিষ্ট মনে তাঁর গণিতচর্চা চালিয়ে যেতে লাগলেন। অধ্যাপক শেশু আয়ার প্রমুখ শুভানুধ্যায়ীরা গণিত বিষয়ে তাঁর গবেষণাপত্র-গুলি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের প্রখ্যাত গণিতবিদ্ অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডির কাছে পাঠাতে বললেন। অধ্যাপক হার্ডির কাছে পত্র লিখতে রামানুজন প্রথমে সম্মত হন নি। কিন্তু তাঁরা বার বার বলায় রামানুজন চিঠি লিখতে শেষ পর্যন্ত সম্মত হলেন। ১৯১৩ সালের ১৬ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তির পুণ্যদিনে তিনি অধ্যাপক হার্ডিকে তাঁর প্রথম পত্র লিখলেন। অধ্যাপক হার্ডির সঙ্গে এই পত্রালাপের সূচনা রামানুজনের জীবনে এক মাহেন্দ্রক্ষণ।

সেই ঐতিহাসিক পত্রে রামানুজন লিখেছিলেন:

শ্রদ্ধেয় মহাশয়,

আপনার কাছে পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছি আমি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে অফিসের হিসাব বিভাগে বাৎসরিক ২০ পাউণ্ড বেতনে নিযুক্ত একজন করণিক। আমার এখন বয়স প্রায় ২৩ বছর। আমার কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেই, বিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠক্রম শুধু শেষ করেছি। বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করার পর আমার অবসর সময় গণিতচর্চাতে আমি ব্যয় করে থাকি। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে যে ধরনের পাঠক্রম অনুসরণ করা হয়, আমি সেপথে অগ্রসর হই নি, কিন্তু নিজের উদ্ভাবিত নতুন পদ্ধতিতে আমি গণিতচর্চা করছি। সাধারণ-ভাবে অপসারী শ্রেণী (Divergent Series) সম্পর্কে আমি বিশেষ অনুসন্ধান করেছি এবং যা ফল পেয়েছি তা স্থানীয়

গণিতজ্ঞদের মতে 'বিস্ময়কর'।……অতি সম্প্রতি 'অর্ডারস অফ ইনফিনিটি' (Orders of Infinity) শিরোনামায় প্রকাশিত আপনার একটি গবেষণা-নিবন্ধ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই নিবন্ধের ৩৬ পৃষ্ঠার এক জায়গায় আপনি বলেছেন, কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোনো মৌলিক সংখ্যার ক্ষেত্রে কোনো সসীম রাশি এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। আমি এমন একটা রাশি বার করেছি যা প্রকৃত ফলের খুব কাছাকাছি, ভুল নগণ্য। আমার এই কাজের কাগজপত্র আপনার কাছে এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এই কাগজগুলি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি দরিদ্র, এই কাগজপত্র প্রকাশের আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আপনি যদি আমার কাজের মূল্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চিত হন, তা হলে আমার আবিষ্কৃত উপপাদ্যগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রকৃত অনুসন্ধানের বিবরণ বা যে রাশি আমি পেয়েছি তা এখানে উল্লেখ করি নি, কিন্তু কি পদ্ধতিতে আমি কাজ করেছি তা-ই শুধু দেখিয়েছি। এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা না থাকায় আপনার যে কোনো উপদেশ আমি বিশেষ মূল্যবান মনে করব। আমার এই পত্রালাপে আপনার অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে থাকলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আপনার
একান্ত বিশ্বস্ত
এস. রামানুজন

এই চিঠির সঙ্গে রামানুজন তাঁর আবিষ্কৃত শতাধিক উপপাদ্যের কাগজপত্র পাঠিয়েছিলেন। অধ্যাপক হার্ডিকে লেখা রামানুজনের এই পত্রখানি কেম্‌ব্রিজের গণিতজ্ঞমহলে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল। এর এক সুন্দর বিবরণ আমরা পাই পরবর্তীকালে

১৯৪১ সালের ২২ এপ্রিলে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত অধ্যাপক ই. এইচ. নেভিলির রামানুজন বিষয়ক কথিকায়। ১৯১4 সালে রামানুজনের সঙ্গে অধ্যাপক নেভিলির সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সেই কথিকায় অধ্যাপক নেভিলি বলেছিলেন: "রামানুজনের সেই চিঠি যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তার কথা কেম্‌ব্রিজের তৎকালীন গণিতজ্ঞ-মহলের কেউ ভুলতে পারেন না। একজন অজানা অপরিচিত ভারতীয় করণিক উপদেশের জন্যে আবেদন করছেন, কারণ তিনি অনভিজ্ঞ; তাঁর উদ্ভাবিত উপপাদ্যগুলি প্রকাশের জন্যে সাহায্য চাইছেন, কারণ তিনি দরিদ্র। কিন্তু তিনি বলছেন, 'যদি এগুলিতে কোনো সারবস্তু থাকে, তা হলেই প্রকাশ করবেন।' এই করণিক (যাঁর সম্পর্কে আমরা আগে কিছুই শুনি নি) এমন সব উপপাদ্য ব্যাখ্যা না করেই লিখেছেন, যার একটিও বিশ্বের কোনো গণিত বিষয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় দেওয়া যায় না। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, প্রথমে মনে হয়েছিল রামানুজনের এই চিঠি একটা ধাপ্পামাত্র। প্রচলিত উপপাদ্যগুলিকে সুকৌশলে ছদ্মবেশ পরিয়ে সাজানো হয়েছে। পরে যাচাই করে দেখা গেল, এই অনুমান ভুল। কারণ চিঠিতে এমন কিছু গাণিতিক সূত্রের উল্লেখ ছিল, যা ইতিপূর্বে কেউ দেন নি। এ সম্পর্কে হার্ডি বলেছেন, 'এ ধরনের জিনিস আমি আগে কখনও দেখি নি। এই সূত্রগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়, একজন অতি উচ্চস্তরের গণিতজ্ঞ ছাড়া কেউ এই ধরনের কাজ করতে পারেন না। এই সূত্রগুলি সত্য, কারণ এগুলি যদি সত্য না হত, তা হলে এগুলি উদ্ভাবনের কল্পনাশক্তি কারো থাকত না।' একজন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ, যিনি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সূত্র আবিষ্কার করেছেন, তিনি তাঁর বন্ধুদের হতবুদ্ধি করবার জন্যে সেগুলিকে ব্যবহার করেন না।"

যিনি পাকা জহুরী, আসল রত্ন চিনতে তাঁর ভুল হয় না। অধ্যাপক হার্ডি-ও তাঁর পত্রপ্রেরকের অনন্য গণিত-প্রতিভা চিনতে ভুল করেন নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করলেন

এবং রামানুজনের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁকে চিঠির উত্তর দিলেন। হার্ডির পত্রোত্তর রামানুজনকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করলো। তারই নিদর্শন পাই অধ্যাপক হার্ডিকে লেখা রামানুজনের ১৯১৩ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় পত্রটিতে। রামানুজন লিখছেন :

'আপনার মধ্যে আমি এমন একজন বন্ধুকে পেয়েছি, যিনি আমার কাজকে সহানুভূতির চোখে দেখেন। আমার গণিতচর্চায় অগ্রসর হওয়ার পথে এটি প্রেরণাস্বরূপ।... আমার মস্তিষ্কের কাজ বজায় রাখার জন্যে একটি জীবিকার প্রয়োজন এবং সেটিই হচ্ছে এখন আমার প্রথম চিন্তা। আপনার কাছ থেকে সহানুভূতিপূর্ণ চিঠি পেলে এখানে বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারের কাছে আমার বৃত্তি পাওয়ার বিশেষ সহায়ক হবে।'

ইতিমধ্যে অধ্যাপক হার্ডি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদপ্তরের সচিবের কাছে একটি চিঠি দেন। চিঠিতে তিনি লেখেন, রামানুজনের যে অনন্য গণিত-প্রতিভা তাতে তিনি অতি উচ্চস্তরের গণিতবিদ হতে পারেন। কাজেই কেম্‌ব্রিজে তাঁর শিক্ষাব্যবস্থার জন্যে কোনো উপায় কি খুঁজে বার করা যায় না? রামানুজন সম্পর্কে অধ্যাপক হার্ডির এই আগ্রহের কথা মাদ্রাজে ছাত্র-উপদেষ্টা কমিটির সচিবকে জানানো হলো। তিনি রামানুজনকে ডেকে পাঠালেন।

রামানুজন এলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—তিনি ইংলণ্ডে যেতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু ধর্মীয় সংস্কার যাঁর মজ্জায় মজ্জায়, তিনি 'ধর্মবিরুদ্ধ' এই প্রস্তাবে রাজী হন কি করে? তা ছাড়া তাঁর মা-ও এই প্রস্তাবে আপত্তি জানালেন। তাই রামানুজন এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। রামানুজনের কাছ থেকে প্রতিকূল পত্র পেয়ে ছাত্র-উপদেষ্টা কমিটির সচিব ১৯১৩ সালের মার্চ মাসের গোড়ায় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পত্র দিলেন।

ইতিমধ্যে আর এক দিক থেকে রামানুজনের প্রসঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরে আসে। ১৯১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের প্রধান ডঃ গিলবার্ট ওয়াকার (Dr. Gilbert Walker) সরকারী কাজ উপলক্ষে মাদ্রাজে আসেন। ডঃ ওয়াকার ছিলেন একজন গণিত বিশেষজ্ঞ এবং সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার। সেই সুযোগে মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সার ফ্রানসিস স্প্রীং রামানুজনের প্রসঙ্গ তাঁর কাছে উত্থাপন করলেন। রামানুজনের গণিতচর্চার কাগজপত্র দেখে ডঃ ওয়াকার প্রভাবিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে একটি পত্র লিখে পাঠালেন:

'মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের হিসাব বিভাগের জনৈক করণিক শ্রীনিবাস রামানুজন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমি তাঁকে দেখি নি। কিন্তু গতকাল সার ফ্রানসিস স্প্রীং তাঁর কিছু গাণিতিক কাজ আমাকে দেখিয়েছেন। তাঁর বয়স ২২ বছর বলে শুনেছি। তাঁর কাজ দেখে আমার ধারণা হয়েছে, কেম্‌ব্রিজ কলেজের গণিতবিষয়ক ফেলোর কাজের মতোই তা মৌলিক। আমি নিঃসংশয়ে বলতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয় যদি রামানুজনকে অন্তত কয়েক বছরের জন্যেও জীবিকার্জনের চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সমস্ত সময় গণিতচর্চায় নিয়োগের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে তাঁদের যোগ্য কাজই করা হবে।'

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে রামানুজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ডঃ ওয়াকার যে গুরুত্বপূর্ণ পত্র দিয়েছিলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের 'বোর্ড অফ স্টাডিজ্' অনুমোদন করেন। বোর্ডের চেয়ারম্যান ১৯১৩ সালের ২৫ মার্চে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে এক পত্রে রামানুজনকে মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তিদানের জন্যে সুপারিশ করেন।

ডঃ ওয়াকার এবং বোর্ড অফ স্টাডিজ্-এর চেয়ারম্যানের পত্র দুখানি রামানুজনের অন্তরাকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পথ প্রশস্ত করে দিল।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এক ঐতিহাসিক অধিবেশনে রামানুজনকে মাসিক ৭৫ টাকা বৃত্তি দানের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

সিণ্ডিকেট রামানুজনকে বৃত্তিদানের সঙ্গে একটি শর্ত অবশ্য যোগ করেন। তাঁরা বললেন, রামানুজনকে তিন মাস অন্তর তাঁর গাণিতিক কাজের বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পেশ করতে হবে। রামানুজন এই শর্ত মেনে নিলেন। ১৯১৩ সালের ৫ আগস্ট ও ৭ নভেম্বর এবং ১৯১৪ সালের ৯ মার্চ তিনি তাঁর ত্রৈমাসিক কাজের বিবরণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। শেষোক্ত কার্যবিবরণী পেশ করার এক সপ্তাহ পরে রামানুজন অধ্যাপক হার্ডির আমন্ত্রণে কেম্ব্রিজে যাত্রা করেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে বৃত্তি দানের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা কিন্তু বিনা বাধায় গৃহীত হয় নি। আইনগত প্রশ্ন তুলে কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে আপত্তি জানান। তাঁরা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী না থাকলে কোনো গবেষককে বৃত্তি দেওয়া যায় না। যেহেতু রামানুজনের কোনো স্নাতকোত্তর ডিগ্রী নেই, তিনি এই বৃত্তি পেতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন বললেন, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষকের অনন্যসাধারণ কাজের কথা বিবেচনা করে এই আইন শিথিল করা যেতে পারে। কিন্তু এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে গভর্নরের অনুমতি প্রয়োজন।

রামানুজনের অনন্য-প্রতিভার কথা বিবেচনা করে আচার্য এই বিষয়ে তাঁর অনুমতি দিতে দ্বিধা করেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তের কথা রামানুজনকে শীঘ্র জানানো হলো এবং ১৯১৩ সালের পয়লা মে রামানুজন পোর্ট ট্রাস্টে করণিকের কাজ থেকে পদত্যাগ করলেন। এরপর গণিতচর্চাই হলো তাঁর একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান এবং পেশাও।

কেম্‌ব্রিজের সাদর আহ্বান

রামানুজনের প্রথম পত্র পেয়েই অধ্যাপক হার্ডি উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতে থাকলে রামানুজনের অনন্য-গণিতপ্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটবে না। উপযুক্ত গাণিতিক পরিবেশে আর্থিক চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে তাঁকে নিবিষ্ট মনে গণিতচর্চার সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। তাঁকে কেম্‌ব্রিজে আনতে পারলে এই কাঙ্ক্ষিত সুযোগ দেওয়া সম্ভব হবে। তাই রামানুজন কেম্‌ব্রিজে আসবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও হার্ডি তাঁর চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

হার্ডি উপলব্ধি করলেন, রামানুজন একলা নিজের থেকে কেম্‌ব্রিজে আসবেন না। কাজেই কাউকে পাঠিয়ে তাঁর সঙ্গে রামানুজনকে কেম্‌ব্রিজে আনবার ব্যবস্থা করাই হবে প্রকৃষ্ট পন্থা। সৌভাগ্যক্রমে সে সুবর্ণ সুযোগই হার্ডির কাছে উপস্থিত হলো। ১৯১৪ সালের গোড়ার দিকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো অধ্যাপক ই. এইচ. নেভিলিকে (E. H. Neville) মাদ্রাজে জ্যামিতি বিষয়ে বক্তৃতামালা দেবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান এবং অধ্যাপক নেভিলি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। হার্ডি এই মাহেন্দ্র সুযোগ হাতছাড়া করলেন না এবং নেভিলিকে অনুরোধ করলেন তিনি বক্তৃতাশেষে কেম্‌ব্রিজে প্রত্যাবর্তনের সময় রামানুজনকে যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। হার্ডির এই অনুরোধে অধ্যাপক নেভিলি সানন্দে রাজী হলেন।

অধ্যাপক নেভিলি মাদ্রাজে পৌঁছে রামানুজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি নিজে যা বলেছিলেন, তা-ই এখানে উদ্ধৃত করছি।

"১৯১৪ সালের গোড়ায় আমি মাদ্রাজে পৌছই। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম বক্তৃতার পর রামানুজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে গণিত বিষয়ে নানা আলোচনা করি। রামানুজন তখন তাঁর একটি নোট-বইয়ের পাতা উল্‌টে আমাকে দেখান। দুদিন পরে তিনি আবার সেই খাতার পাতাগুলো দেখান এবং আমাদের তৃতীয় সাক্ষাতের পর বলেন, 'আপনি বোধ হয় এই নোট-বইটি আপনার সঙ্গে নিয়ে যেতে চান।' রামানুজনের এই অবিশ্বাস্য কথা শুনে আমার দম যেন বন্ধ হয়ে এলো! এই অমূল্য নোট-বইটি তিনি কখনও হাতছাড়া করেন নি, কোনো ভারতীয় এর মর্মোদ্ধার করতে পারেন নি, কোনো ইংরেজকে এই নোট-বইটি বিশ্বাস করে দেওয়া যায় না। ইংরেজদের সঙ্গে ভারতবাসীর তখন যে সম্পর্ক, তাতে সংশয় জাগাই স্বাভাবিক। তবু রামানুজন যে আমাকে বিশ্বাস করে নোট-বইটি দিতে চেয়েছেন, তার কারণ আমি সরকারী প্রশাসনের বাইরে থেকে এসেছি।

"রামানুজনের আস্থা অর্জন করে আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে কেম্‌ব্রিজে যাবার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলুম। আমি আনন্দ ও বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, রামানুজন কেম্‌ব্রিজে যাবার কথায় এখন আর তেমন আপত্তি করলেন না। তিনি জানালেন, তাঁর মা-বাবা আর আপত্তি করবেন না। কারণ তাঁর মা একটি জাগ্রত স্বপ্নে দেখেছেন—কয়েকজন ইউরোপীয় রামানুজনকে ঘিরে বসে আছেন এবং দেবী নামগিরি তাঁকে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি যেন তাঁর ছেলের জীবনের আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের পথে বাধাস্বরূপ না হন।

"অপর কেউ যাতে রামানুজনকে ভুল বুঝিয়ে ইউরোপ যাত্রা থেকে নিবৃত্ত না করে, সেজন্যে আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের জানালুম রামানুজনের নিজের স্বার্থেই কেম্‌ব্রিজে যাবার প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আমি সঙ্গে সঙ্গে হার্ডিকে জানালুম, দুর্লঙ্ঘ্য বাধাগুলো এখন অপসারিত হয়েছে এবং রামানুজনের জন্যে আর্থিক সাহায্যের যাতে ব্যবস্থা করা যায় সেদিকে তিনি যেন দেখেন।

মাদ্রাজ থেকে অনুদান লাভের চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু সে চেষ্টা যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে ইংল্যাণ্ডে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করতেই হবে। অধ্যাপক হার্ডির কাছে রামানুজন ও তাঁর নোট-বই সম্পর্কে আমি কি লিখেছিলুম তা আমার স্মরণ নেই। কিন্তু তাঁকে সুস্পষ্ট-ভাবে জানিয়েছিলুম, রামানুজন কেম্‌ব্রিজে আসতে আগ্রহী হলে আর্থিক বিষয়টি যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। হার্ডি প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন। তিনি আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, লণ্ডনের ভারতীয় দূতাবাস থেকে এ ধরনের অজ্ঞাতপরিচয় প্রতিভা-ধরের কথা মাঝেমধ্যে শোনা যায়। হার্ডির এই সতর্কবাণীতে আমি তেমন গুরুত্ব দিই নি। কারণ আমি রামানুজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি এবং তাঁর নোট-বইও দেখেছি, কিন্তু হার্ডির পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি।”

কিন্তু রামানুজনের ইংল্যাণ্ডে গিয়ে উচ্চতর গণিতচর্চার জন্যে আর্থিক ব্যবস্থার একটা প্রশ্ন ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেটি বিশেষ বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় নি। কারণ হার্ডি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্র দপ্তরের সচিবকে এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেই লিখেছিলেন। এই চিঠিটি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে তাঁদের বিবেচনার জন্যে পাঠানো হয়। এ ছাড়া, অধ্যাপক নেভিলি স্বয়ং ১৯১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে একটি স্মারকপত্র পেশ করেন। তাতে তিনি লেখেন:

“মাদ্রাজের শ্রীনিবাস রামানুজনের প্রতিভা আবিষ্কার আমাদের কালে গণিত-জগতে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা। গণিতের আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে রামানুজনের পরিচয়সাধন এবং গণিতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া একান্ত দরকার।

“আমি বিশ্বাস করি, রামানুজন নিজেও পাশ্চাত্যের অগ্রণী গণি-তজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সাড়া দেবেন। তার ফলে গণিতের ইতিহাসে তাঁর নাম পৃথিবীর অগ্রগণ্য গণিতজ্ঞদের অন্যতম

হিসাবে লিখিত হবে এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ শহর তাঁর অজ্ঞাত পরিচয় থেকে খ্যাতির শীর্ষে উত্তরণে সহায়তা করার জন্যে গর্ব অনুভব করবে।"

অধ্যাপক নেভিলির এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

অধ্যাপক নেভিলি স্মারকপত্র পেশ করার একদিন পরে অর্থাৎ ২৯ জানুয়ারি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের গণিত-অধ্যাপক আর. লিটলহেলস্ (R. Littlehailes) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে এই প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘপত্র লেখেন। এই সব প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হলো পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সার ফ্রান্সিস স্প্রাং-এর একটি মহৎ প্রয়াস। তিনি রামানুজনের প্রসঙ্গ নিয়ে মাদ্রাজের রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ১৯১৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি তাঁর সচিবের কাছে একটি পত্র লেখেন। এই পত্রে তিনি লিখেছিলেন:

"আমার নিশ্চিত ধারণা, মহামান্য রাজ্যপালের একটি শিক্ষা দপ্তর আছে। সে কারণে এমন একটি বিষয়ে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে বিষয়টি কয়েকদিনের মধ্যে তাঁর বিবেচনার জন্যে আসবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। বিষয়টি হচ্ছে আমাদের সংস্থার একজন করণিক শ্রীনিবাস রামানুজন সম্পর্কিত। মহামান্য রাজ্যপাল আমার কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জেনেছেন, বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞরা তাঁকে অনন্য (অলৌকিক) গণিত-প্রতিভাসম্পন্ন বলে মনে করেন। গত ৮।৯ মাস ধরে কেমব্রিজ, সিমলা ও মাদ্রাজের প্রথম শ্রেণীর গণিতজ্ঞরা রামানুজনের গণিত-বিষয়ক কিছু কাজ যাচাই করে দেখেছেন এবং সে কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।, মহামান্য রাজ্যপাল হয়তো জানেন, কেমব্রিজের সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার ও ট্রিনিটি ফেলো অধ্যাপক নেভিলি এখন মাদ্রাজে সাম্মানিক ছাত্রদের কাছে উচ্চতর গণিত বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দিচ্ছেন। কেমব্রিজ থেকে নির্দেশ পেয়ে তিনি রামানুজন সম্পর্কে গভীর আগ্রহী হয়েছেন এবং তাঁকে দু এক

বছরের জন্যে কেম্ব্রিজে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন, যাতে বিশেষজ্ঞদের অধীনে কাজ করে বিশ্বের কাছে তাঁর গণিতপ্রতিভার সম্যক পরিচয় দিতে পারেন এবং খ্যাতি ও সম্মান লাভ করতে পারেন। মাদ্রাজে পড়ে থাকলে তাঁর প্রতিভার অপচয় ও অপমৃত্যু ঘটতে পারে।

এখন আমি আমার মূল বক্তব্যে আসছি, যে বিষয়ে মহামান্য রাজ্যপাল বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন। গতকাল সন্ধ্যায় মিঃ লিটলহেলস ও অন্যান্যদের কাছ থেকে জানতে পেরেছি, বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেট সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে রামানুজনের দু বৎসরকাল ইংল্যাণ্ডে অবস্থানের জন্যে অনুদান হিসেবে ১০ হাজার টাকা আলাদা করে রেখেছেন। লিটলহেলস ও নেভিলি মহামান্য রাজ্যপালকে অনুরোধ করার জন্যে আমাকে বলেছেন যাতে বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এই সিদ্ধান্ত তিনি শীঘ্র অনুমোদন করে দেন। কিন্তু একটা কথা স্পষ্ট করে জানাতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে একথা আমি লিখছি না। আমি লিখছি আমার নিজস্ব কর্মী রামানুজনের কথা ভেবে এবং গণিতে আমার আগ্রহের জন্যে। মিঃ আর্থার ডেভিস রামানুজনের ইংল্যাণ্ডে যাত্রার ব্যবস্থা করবেন এবং রামানুজন তাঁর ধর্মীয় আচার-আচরণ যথাবিধি অনুসরণ করতে পারবেন।

আমি নিজে এমন গণিত-বিশেষজ্ঞ নই যে গণিতে রামানুজনের নিজস্ব নতুন চিন্তাধারার যথাযথ মূল্যায়ণ করতে পারি। কিন্তু যাঁরা এই মূল্যায়ণের যোগ্য অধিকারী, তাঁদের অনেকে আমাকে বলেছেন, রামানুজনের কাজ যুগান্তকর এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে আর্থিক সাহায্য করলে তা যথোপযুক্তই হবে।"

ফ্রানসিস্ স্প্রীং-এর এই গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পেয়ে রাজ্যপালের একান্ত সচিব সেদিনই তার প্রাপ্তিস্বীকার করে জানান:

"আপনার ৫ ফেব্রুয়ারির পত্র পেয়েছি। রামানুজন যাতে কেম্ব্রিজে তাঁর গণিতচর্চা অব্যাহত রাখতে পারেন সেজন্যে তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আর্থিক সাহায্য করা উচিত বলে আপনি

যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন মহামান্য রাজ্যপাল তার প্রতি সহানু-ভূতিশীল এবং এই প্রস্তাব কার্যকর করতে তাঁর পক্ষে যা কিছু করণীয় তা তিনি সানন্দে করবেন।"

রাজ্যপালের অনুমোদন পেয়ে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় রামানুজনকে ইংল্যাণ্ডে গণিতচর্চার জন্যে বছরে ২৫০ পাউণ্ড অনুদান মঞ্জুর করলেন। ১৯১৪ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে প্রথমে দু বছরের জন্যে এই অনুদান দেওয়া হয় এবং পরে তা পাঁচ বছরের জন্যে সম্প্রসারিত হয়। ইংল্যাণ্ডে যাবার জাহাজ-ভাড়া ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচও তাঁরা বহন করতে সম্মত হন।

রামানুজনের ইংল্যাণ্ডে যাত্রার বাধাগুলি এইভাবে একে একে অপসারিত হলো। তবু রামানুজনের মনে একটা দুশ্চিন্তা রয়ে গেল—সে দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর মা-বাবার আর্থিক অস্বচ্ছলতা। এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা না করে তিনি শান্তিতে ইংল্যাণ্ডে যাত্রা করতে পারবেন না। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানালেন—তাঁরা তাঁকে যে অনুদান দিচ্ছেন তা থেকে মাসে ৬০ টাকা কুম্ভকোনম-এ তাঁর মা-বাবার কাছে যেন পঠিয়ে দেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রামানুজনের এই অনুরোধে সম্মত হলেন।

সার ফ্রান্সিস্ স্প্রীং জাহাজের এজেন্টদের লিখে জানিয়ে দিয়েছিলেন, রামানুজনের ইংল্যাণ্ডের যাবার সারা পথেই তাঁকে যেন সম্পূর্ণ নিরামিষ খাদ্য দেওয়া হয়।

সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে এবং তাঁর পরমাকাঙ্ক্ষিত গণিতচর্চার মনপ্রাণ সমর্পণের অভিলাষ নিয়ে রামানুজন ১৯১৪ সালের ১৭ মার্চ মাদ্রাজ থেকে 'নেভাসা' (S. S. Nevasa) জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

প্রায় একমাস পরে ৭ এপ্রিল রামানুজন লণ্ডনে এসে পৌছলেন। সেখান থেকে তিনি কেমব্রিজে গেলেন এবং সেখানকার ট্রিনিটি কলেজে তাঁকে গ্রহণ করা হলো। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে এককালীন ৬০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করলেন



ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হবার
পর রামানুজন



অধ্যাপক জি এইচ হার্ডি

Suez
20-3-14

Dear Mr Krishna Rao,

Reached Suez this evening. The Steamer arrived on the 15th at Madras and I was very busy the next day (Sending my people to Kumbakonam after packing up things, going to Wrenn Bennett to buy things, to the College, town, etc.) and so I couldn't go to you; but I told your brother to inform you of my starting on the 17th morning and thought I could see you at the Harbour.

For the first three days I was very uncomfortable and took very little food and after that I have been alright as the sea is very smooth and there is no fear of sea sickness. I do not know whether I have to go to Cambridge directly or stay at London and then go. I shall write to you after I reach England and everything is definitely settled. My best compliments to your brother and respects and warmest thanks to your uncle.

I am
Yours very sincerely
S. Ramanujan

সুয়েজ থেকে কৃষ্ণ রাওকে লেখা রামানুজনের পত্রের প্রতিলিপি

জীবনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়

এতদিন যে গণিতচর্চা ছিল রামানুজনের জীবনের ধ্যানজ্ঞান-স্বপ্ন, সেই গণিতচর্চার আদর্শ পীঠস্থানে এবং আদর্শ মানুষটির কাছে অবশেষে তিনি এসে উপস্থিত হলেন। গণিত-জগতের তখন আদর্শ পীঠস্থান কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ এবং আদর্শ মানুষ হলেন অধ্যাপক জি এইচ হার্ডি। রামানুজন ও হার্ডির এই সম্মিলন গণিতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা—যা তাঁদের উভয়কেই অমর করে রেখেছে।

কেমব্রিজে এসে রামানুজন প্রথম দু মাস অধ্যাপক নেভিলির বাড়িতে অতিথি হিসাবে ছিলেন। এরপর ট্রিনিটি কলেজের আবাসে স্থান পেয়ে তিনি সেখানে চলে যান। যে দু মাস তিনি নেভিলির সঙ্গে ছিলেন, তার এক সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় গৃহস্বামীর প্রতিবেদন থেকে। অধ্যাপক নেভিলির কথায় বলতে গেলে—

"১৯১৪ সালের এপ্রিলে কেমব্রিজে এসে রামানুজন দু মাস আমার বাড়িতে ছিলেন। তারপর জুলাই মাসে ট্রিনিটি কলেজের আবাসে স্থান পেয়ে তিনি চলে যান। অপরিচিত এক জগতে এসে তিনি প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা বোধ করেন। যে খাদ্যে তিনি অভ্যস্ত নন তা খেতে হয় এবং যে ধরনের জুতো তিনি ব্যবহার করতেন না তা পরতে হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সুখী। কারণ গণিতচর্চায় উপযুক্ত পরিবেশ তিনি পেয়েছেন এবং সেই সঙ্গে উপযুক্ত সঙ্গীও পেয়েছেন। কিন্তু সেই বছর গ্রীষ্মকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তাঁর গণিতচর্চার ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। যে সব গণিত-বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে তিনি [illegible]

করবেন বলে আশা করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ছেড়ে চলে যান কিংবা যুদ্ধের কাজে যোগদান করেন। একমাত্র হার্ডি থেকে যান। রামানুজনের জন্যে হার্ডি প্রভূত সময় ব্যয় করতেন এবং পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা উভয়েই লাভবান হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে হার্ডি বলেছেন, 'আমি তাঁকে কোনো কোনো বিষয়ে আলোকপাত করি। কিন্তু তাঁকে যতটুকু শিখিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি আমি নিজে শিখেছি তাঁর কাছ থেকে।' রামানুজনের নোট-বই-এর চেয়ে কেমব্রিজে প্রকাশিত গবেষণা-পত্রের সংখ্যা যদি কম হয়ে থাকে এবং ভারতে থাকতে রামানুজন গণিত বিষয়ে যেসব নিজস্ব ধ্যানধারণা ব্যক্ত করেছিলেন তার অনেকগুলিই যদি ইংল্যাণ্ডে সমাদৃত না হয়ে থাকে, তার কারণ হার্ডি নিজে যেসব বিষয়ে ওয়াকিবহাল ছিলেন কেবল সেসব বিষয়েই তিনি রামানুজনকে আলোকপাত করতেন। যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার দরুন রামানুজন অন্যান্য গণিতবিশেষজ্ঞদের (যাঁরা তাঁর আগ্রহের বিষয়ে সম-আগ্রহী ছিলেন) সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এর ফলে হার্ডির সাহচর্যে তিনি এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়েন যে তাঁদের যৌথ কাজে পৃথক সত্তা সবসময় নির্ধারণ করা যেত না।"

কেমব্রিজে রামানুজন এসে পৌঁছবার কয়েক মাসের মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার দরুন একের পর এক বাধা দেখা দিতে থাকে। তার মধ্যে প্রধান হলো অধ্যাপক জে. ই. লিটলউড রামানুজনের সঙ্গে থাকতে পারেন নি এবং একমাত্র হার্ডি ছিলেন তাঁর সহযোগী হয়ে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক হার্ডি ১৯১৫ সালের ১১ নভেম্বর মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে একটি চিঠিতে যে মন্তব্য করেন তা থেকে আমরা এই বিষয়টি ভালোভাবে জানতে পারি। হার্ডি লিখছেন :

"রামানুজনের এখানে গণিতচর্চার পথে মহাযুদ্ধ অনেক-খানি প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। অধ্যাপক লিটলউড, যিনি

আমার সহযোগী হয়ে তাঁকে অনেক বিষয়ে আলোকপাত করতে পারতেন, দূরে চলে গেছেন এবং এমন একজন প্রতিভাধর ছাত্রের পক্ষে একজন মাত্র শিক্ষক যথেষ্ট নন।...আধুনিককালে ভারতীয় গণিতজ্ঞদের মধ্যে রামানুজন নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। বিষয় নির্বাচনে এবং পদ্ধতি অনুসরণে তিনি নিজস্ব মতকে সব সময় প্রাধান্য দিয়ে থাকেন—এটা একরকম একগুঁয়েমি। কিন্তু তাঁর অনন্য-প্রতিভা সম্পর্কে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। আমি যেসব গণিতজ্ঞের সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে রামানুজন হচ্ছেন সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।"

যথার্থ সম-আগ্রহী সহযোগীর অভাব ছাড়া আর যে দুটি প্রধান অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা হচ্ছে থাকা ও খাওয়ার অসুবিধা। রামানুজন কিন্তু এই অসুবিধাগুলিকে 'অসুবিধা' বলেই মনে করতেন না এবং গণিতচর্চা নিয়ে আত্মনিমগ্ন থাকতেন সবসময়। কেম্ব্রিজে আসবার অল্পকালের মধ্যে রামানুজন ছাত্র ও অধ্যাপক উভয় সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে অন্যতম গণিত অধ্যাপক ছিলেন মিঃ আর্থার বেরী (Arthur Berry)। তাঁর একটি প্রতিবেদনে জানা যায়:

"আমি একদিন গণিতের ক্লাশ নিচ্ছি। এমন সময় রামানুজন নীরবে ক্লাশে এসে ঢুকলো। আমি বোর্ডে কয়েকটি সূত্রের সমাধান করছিলুম। রামানুজনের দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলুম, আমি যা করছি তা সে অনুসরণ করছে কিনা। এক সময় দেখলুম, তার মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং তাকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, সে কিছু বলতে চায় কিনা। সে সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো এবং বোর্ডের কাছে এসে কয়েকটি ফলাফল লিখে দিল, যা আমি তখনও পর্যন্ত প্রমাণ করি নি। রামানুজন নিশ্চয় তার স্বজ্ঞার বলেই এই ফলে উপনীত হতে পেরেছিল। সংখ্যাতত্ত্বে (Theory of numbers) রামানুজনের যে অনন্য-প্রতিভা তা মূলত স্বজ্ঞা-জনিত বলে আমি

মনে করি। অন্যান্য তত্ত্বীয় গণিতজ্ঞদের মতো রামানুজন অসংখ্য অনুমান করে নিতে পারতো। অনেক ফলাফলই অনায়াসে তার মনে উদিত হত। অবশ্য সে জানতো, তার স্বতঃ-প্রদত্ত তত্ত্বগুলি প্রমাণ করতে যথেষ্ট বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে।"

কেম্‌ব্রিজে রামানুজনের জীবন ছিল নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও একাগ্র গণিত-সাধনার জীবন। রাত্রে চারিদিক যখন শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে যেত, তখন রামানুজন তাঁর গণিতচর্চায় নিমগ্ন হতেন। অনেক সময় গণিতের গভীরে এত তন্ময় হয়ে যেতেন যে কখন রাত্রি পেরিয়ে ভোর হয়ে গেছে তা টের পেতেন না।

কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রাবাসে রামানুজন থাকতেন। সেখানকার অন্যান্য আবাসিকেরা তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি দেখাতেন। সাধারণত আবাসিকদের দুটি ঘর দেওয়া হত, কিন্তু রামানুজনকে দেওয়া হয়েছিল তিনখানি ঘর। তিনি নিজের হাতে রান্না করতেন। তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষাশী ছিলেন—ডিম, পেঁয়াজ, এমন কি টমেটো পর্যন্ত খেতেন না। রান্না করতে তাঁর বেশ কিছু সময় নষ্ট হত। তাই তাঁর কোনো কোনো বন্ধু প্রস্তাব করলেন, কলেজের রন্ধনশালা থেকে আলুভাজা ও আলুর তরকারী করিয়ে নিতে পারেন, তাতে সময়ের সাশ্রয় হবে। তাঁদের প্রস্তাবে রামানুজন রাজী হলেন। রন্ধনশালায় তৈরী খাবার আনিয়ে খেতে লাগলেন।

কয়েকদিন পরে সেখানকার আবাসিক এক তামিল ব্রাহ্মণ (যিনি পরিতৃপ্তির সঙ্গে মাংস খেতেন) রামানুজনকে উত্যক্ত করবার জন্যে বললেন: 'তুমি কি জানো না এখানে চর্বি দিয়ে আলু ভাজা হয়?'

এই কথায় বিস্মিত হয়ে রামানুজন জিজ্ঞেস করলেন: 'সত্যি নাকি?'

ভদ্রলোক ঠেশ দিয়ে বললেন: 'হ্যাঁ, তবে আর তোমায় বলছি কি!'

এই কথা শুনে রামানুজন এরপর থেকে কলেজের রন্ধনশালা বা বাইরের অন্য কোথাও থেকে রান্না-করা খাবার আনিয়ে খেতেন না। নিজের হাতেই রান্না করে খেতেন।

কেম্ব্রিজে অবস্থান কালে রামানুজন শুধু গণিতচর্চা নিয়েই ব্যাপৃত থাকতেন, অন্য কোনো কিছুতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ভারতীয় ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত 'ভারতীয় মজলিশ'-এর ক্রিয়াকলাপেও তিনি অংশ গ্রহণ করতেন না।

রামানুজন যখন কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে যোগদান করেন, তার কিছুকাল আগে ১৯১৩ সালের অক্টোবর মাসে প্রখ্যাত রাশি-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ কেম্ব্রিজের কিংস কলেজে যোগ দেন। রামানুজন কেম্ব্রিজে এসে পৌঁছবার কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে প্রশান্তচন্দ্রের পরিচয় ঘটে এবং বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। প্রশান্তচন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে লিখেছেন :

"একদিন আমি ট্রিনিটি কলেজে রামানুজনের সঙ্গে দেখা করতে যাই। সেদিনটা ছিল প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রামানুজন তখন আগুনের কাছে বসেছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম, রাত্রে তিনি শরীর গরম করে রেখেছিলেন তো? রামানুজন বললেন, তিনি বেশ ঠাণ্ডা অনুভব করেছিলেন। এজন্যে তিনি রাত্রে ওভারকোট পরে ও তার ওপর শাল জড়িয়ে ঘুমিয়েছিলেন। আমি তখন তাঁর শোবার ঘরে দেখতে গেলুম রাত্রে গায়ে চাপা দেবার মতো তাঁর উপযুক্ত কম্বল আছে কিনা। গিয়ে দেখলুম, বিছানায় একাধিক কম্বল রয়েছে, কিন্তু সেগুলোকে শক্ত করে একসঙ্গে বেঁধে তার ওপর বেডকভার বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শোবার সময় কম্বলগুলোকে যে একটার ওপর একটা বিছিয়ে বিছানায় শুতে হয় তা রামানুজন জানতেন না। বেড কভারটা ছিল আলগা, রামানুজন ওভারকোট পরে ও তার ওপর শাল জড়িয়ে বেডকভারের তলায় শুয়েছিলেন। আমি তাঁকে দেখিয়ে দিলুম কিভাবে কম্বলগুলো বিছিয়ে তার তলায়

শুতে হয়। এতে রামানুজন অত্যন্ত খুশী হন। রবিবার সকালে আমরা দুজনে প্রায়ই বেড়াতে যেতুম। দীর্ঘপথ বেড়াতে বেড়াতে আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হত। জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে রামানুজন ছিলেন কিছুটা প্রগতিশীল, কিন্তু সংস্কারসাধনেচ্ছু ছিলেন না।

সংখ্যাতত্ত্বে রামানুজনের সাবলীলতা ছিল বহুলাংশে স্বজ্ঞাজাত। অন্যান্য গণিতবিশেষজ্ঞদের মতো তিনি অসংখ্য অনুমান করে নিতে পারতেন। বিনা আয়াসেই তিনি বহু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে দিতেন। তবে তিনি জানতেন, তাঁর এই দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে যথেষ্ট বুদ্ধি খাটাতে হবে। গাণিতিক কাজের চেয়ে দার্শনিক ধারণার বেশি আগ্রহী বলে তাঁকে যে মনে হত, তার কারণ বোধ হয় এটাই। দার্শনিক প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি এত উৎসাহের সঙ্গে কথা বলতেন যে আমার মাঝে মাঝে মনে হত, তাঁর গাণিতিক অনুমানগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বুদ্ধি খাটিয়ে প্রমাণ বার করার চেয়ে দার্শনিক তত্ত্বগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তিনি বেশি খুশী হতেন।

১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত পাঁচবছর কাল রামানুজন কেম্‌ব্রিজে অবস্থান করেছিলেন। এই পাঁচ বছরে যেসব গণিতজ্ঞ ও গণিত-বিশারদের সংস্পর্শে রামানুজন এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই তাঁর অনন্য গণিতপ্রতিভা, গণিত বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও বৈশিষ্ট্যে অভিভূত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক জি এইচ. হার্ডি, অধ্যাপক জে. ই. লিটলউড, অধ্যাপক এল. জে. মরডেল প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইংল্যাণ্ডে পাঁচ বছর অবস্থানকালে রামানুজনের একুশটি গবেষণাপত্র ইউরোপের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে পাঁচটি প্রকাশিত হয় অধ্যাপক হার্ডির সহযোগে।

ইউরোপের বিজ্ঞানীমহলে এই গবেষণাপত্রগুলি উচ্চ প্রশংসিত হয়। গণিতবিদ্যায় রামানুজনের অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিতে

ইংল্যাণ্ডের রয়েল সোসাইটি ১৯১৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেন। যুক্তরাজ্যে বা তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিজ্ঞানীমহলে এই 'এফ. আর. এস.' (FRS) নির্বাচনকে সর্বোচ্চ সম্মান বলে মনে করা হত।

ভারতীয়দের মধ্যে রামানুজনই প্রথম এফ. আর. এস. বলে সাধারণত মনে করা হয়। তবে ১৮৪১ সালে আরদেশীর কার্সেটজি নামে এক ভারতীয় জাহাজনির্মাতা ও ইঞ্জিনীয়ার এফ. আর. এস. নির্বাচিত হন। কিন্তু বিজ্ঞানজগতে তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না, এবং তাঁর মৌলিক গবেষণাপত্র সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সেকারণে বৈজ্ঞানিক অবদানের বিচারে রামানুজনকেই প্রকৃত প্রথম ভারতীয় এফ. আর. এস. বলা যায়।

লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলোরূপে রামানুজনের এই নির্বাচন ভারতীয় বিজ্ঞানী ও তরুণ গবেষকদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব প্রেরণা সঞ্চার করলো। বিশ্বের বিজ্ঞান-দরবারে ভারতীয়েরা যে মৌলিক অবদানের স্বর্ণস্বাক্ষর রাখতে পারেন তা রামানুজন প্রথম দেখিয়ে দিলেন। রামানুজন এফ. আর. এস. নির্বাচিত হবার এক দশকের মধ্যে আরও তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী কয়েক বছরের ব্যবধানে রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২০ সালে জগদীশচন্দ্র বসু, ১৯২৪ সালে চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন এবং ১৯২৭ সালে মেঘনাদ সাহা। এর পরবর্তীকালে আরও বহু ভারতীয় বিজ্ঞানী এফ. আর. এস. নির্বাচিত হয়েছেন ও হচ্ছেন। ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করায় ভারতীয় সাহিত্য-কলায় যেমন এক নব যুগের সূচনা হয়েছিল, তেমনি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে রামানুজন এফ. আর. এস. নির্বাচিত হয়ে ভারতের বিজ্ঞানী মহলে এক নবযুগের সূচনা করেছিলেন।

যে ট্রিনিটি কলেজে রামানুজন গণিত শিক্ষা ও গবেষণা করতেন, তাঁরাও রামানুজনের প্রতিভার স্বীকৃতিতে তাঁকে কলেজের ফেলো নির্বাচিত করলেন ১৯১৮ সালের ১৩ অকটোবর। কোনো ভারতী-

য়ের পক্ষে ট্রেনিটি কলেজের এই দুর্লভ সম্মাননা লাভ এই প্রথম। এই ফেলোশিপের দরুন রামানুজন বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি ছ বছরের জন্যে লাভ করেন এবং এজন্য তাঁকে কোনো কর দিতে বা শর্ত মেনে চলতে হত না।

রামানুজনের ট্রিনিটি কলেজের ফেলো নির্বাচিত হবার সুসংবাদ মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অধ্যাপক হার্ডি অনতিবিলম্বে লিখে জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারারের কাছে প্রেরিত পত্রে তিনি মন্তব্য করেন ঃ

> "শ্রীনিবাস রামানুজন এমন বৈজ্ঞানিক প্রত্যয় ও সম্মান নিয়ে ভারতে ফিরবেন, যা ইতিপূর্বে কোনো ভারতীয় লাভ করেন নি। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, ভারত তাঁকে এক পরম সম্পদ বলে মনে করবে।"

শুধু এই মন্তব্য করেই হার্ডি ক্ষান্ত হন নি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানান—তাঁরা এমন একটা পাকা ব্যবস্থা করে দিন যাতে রামানুজন নিশ্চিন্তায় ও নির্বিঘ্নে কেম্ব্রিজে তাঁর গবেষণা-কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে কালাপহরণ করেন নি। তাঁরা ১৯১৯ সালের পয়লা এপ্রিল (যেদিন পূর্বে মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির মেয়াদ শেষ হয়) থেকে পাঁচ বছরের জন্যে রামানুজনকে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করেন। রামানুজনের ভারতে ফিরে আসার ব্যয়ভারও তাঁরা বহন করতে সম্মত হন এবং বৃত্তির মেয়াদের মধ্যে ইউরোপে যাবার ও সেখান থেকে ফিরে আসার যাবতীয় খরচও তাঁরা দেবেন বলে জানান।

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তের বিষয় জানতে পেরে রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে রেজিস্ট্রারারের কাছে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্র লেখেন। সেই পত্রে তিনি লিখেছিলেন ঃ

২ কলিনেট রোড, পুটনে,
১১ জানুয়ারি ১৯১৯

মহাশয়,

৯ ডিসেম্বর ১৯১৮ তারিখের আপনার পত্র পেয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে যে অতি-বদান্য সাহায্য করেছেন তা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করছি।

তবে আমি মনে করি, ভারতে আমার প্রত্যাবর্তনের (যা শীঘ্রই হবে বলে আমি আশা রাখি) পর আমার জন্যে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা আমার প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই হবে। আমি আশা করব, ইংল্যাণ্ডে আমার যাবতীয় খরচ মেটাবার পর যে অর্থ থাকবে তা থেকে বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড যেন আমার মা-বাবাকে দেওয়া হয় এবং উদ্বৃত্ত অর্থ কোনো শিক্ষাসংক্রান্ত উদ্দেশ্যে, বিশেষ করে দরিদ্র ও অনাথ ছেলেদের স্কুলের মাইনে এবং তাদের পাঠ্যপুস্তক কিনে দেবার জন্যে ব্যয় করা হয়। ভারতে আমার প্রত্যাবর্তনের পর এই বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে। •

শারীরিক অসুস্থতার দরুন গত দু'বছর আমি আগের মতো গণিতচর্চা তেমন করতে পারি নি, এজন্যে আমি বিশেষ দুঃখিত। আশা রাখি, শীঘ্রই আমি আরও বেশী গবেষণাকার্য করতে পারব এবং আমাকে যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার যোগ্য বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পারব।

আপনার
একান্ত অনুগত
এস. রামানুজন

রামানুজনের এই চিঠিটি একটি অসাধারণ চিঠি। চিঠির ছত্রে ছত্রে তাঁর নম্রতা, মা-বাবার প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং দরিদ্র দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে গভীর সহানুভূতি সুপরিস্ফুট। সর্বোপরি গণিতের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠা এবং তাঁর বিবেকসম্পন্ন প্রকৃতি এই চিঠিতে উদ্ভাসিত।

যে পাঁচ বছর রামানুজন কেম্‌ব্রিজে ছিলেন, সেই বছরগুলিতে তিনি গণিতচর্চা নিয়ে কঠিন মানসিক পরিশ্রম করেছিলেন। কিন্তু সেই অনুপাতে শরীরের প্রতি তিনি তেমন নজর দেন নি। ধর্মীয় সংস্কারের বশে তিনি বাইরের রান্না-করা কোনো খাদ্য আহার করতেন না, নিজের হাতে রান্না কার খেতেন। কিন্তু গণিতই যাঁর শয়নে-স্বপ্নে, আহারে-বিহারে একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, তিনি রান্নার জন্যে কতটুকু সময় দিতে পারেন! ফলে যা তিনি খেতেন তাতে শরীরের পুষ্টি সাধন হত না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এভাবে অপুষ্টিতে তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙতে থাকে। এর ওপর ছিল মা-বাবা ও স্ত্রীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে মানসিক উদ্বেগ। স্নায়ুর ওপর এর ধকল পড়ত প্রচণ্ড। সর্বোপরি দক্ষিণ ভারতে দুটি ঋতুর সঙ্গে রামানুজন পরিচিত ছিলেন—একটি হলো নাতিশীতোষ্ণ এবং অপরটি উষ্ণ। কিন্তু ইংল্যাণ্ডে এসে তাঁকে সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি ঋতুর সম্মুখীন হতে হয়—একটি শীত এবং অপরটি অতি-শীত। একদিকে খাদ্যের অপুষ্টি, অপরদিকে অপরিচিত বিপরীত আবহাওয়া তাঁর শরীরের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ফলে তিনি যে ফুসফুসের ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হন, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! চিকিৎসার জন্যে রামানুজনকে ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মকালে কেম্‌ব্রিজে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলো। কিন্তু সেখানে বিশেষ সুফল পাওয়া গেল না। তখন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে তাঁকে প্রথমে ওয়েলফ-এর ও পরে লণ্ডনের একটি স্যানাটোরিয়ামে পাঠানো হয়। তাতে স্বাস্থ্যের কিছু উন্নতি দেখা গেল। কিন্তু তাঁর চিকিৎসকেরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে পরামর্শ দিলেন-ভারতে তাঁর পরিচিত আবহাওয়া ও আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তাঁকে পাঠিয়ে দিলে স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। সেই অনুযায়ী ১৯১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রামানুজন তাঁর গুণগ্রাহী বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের কাছে বিদায় নিয়ে ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করলেন

দুই মহান সহযোগী

অপরিচিতি ও অখ্যাতির গণ্ডী থেকে বিজ্ঞানজগতে খ্যাতির শিখরে রামানুজনের উত্তরণের কাহিনী এক বিস্ময়কর ঘটনা। কোথায় ছিলেন সুদূর ভারতে এক অজানা অচেনা গণিত-পাগল সামান্য করণিক শ্রীনিবাস রামানুজন, আর কোথায় ছিলেন কেমব্রিজে গণিত-শাস্ত্রের দিক্‌পাল অধ্যাপক গডফ্রে হ্যারল্ড্‌ হার্ডি! কিন্তু যিনি প্রকৃত জহুরী, জহর চিনতে তাঁর বিলম্ব ঘটে না। হার্ডিরও বিলম্ব ঘটে নি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি অনুরূপ ঘটনার কথা স্বভাবতই মনে পড়ে যায়। ১৯২৪ সালে তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বোস সংখ্যায়ন' সম্পর্কিত গবেষণাপত্রটি যখন মহাবিজ্ঞানী আইনষ্টাইনের অভিমত জানবার জন্যে পাঠিয়ে-ছিলেন, তখন আইনষ্টাইন তাঁর কোনো পরিচয়ই জানতেন না। কিন্তু গবেষণাপত্রটির অভিনবত্বে ও গুরুত্বে এত আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে নিজে সেটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে বিশিষ্ট বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন। সত্যেন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল তাঁর কাছে গৌণ, গবেষণার অশেষ গুরুত্বই ছিল মুখ্য।

মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের করণিক রামানুজন তাঁর গণিতচর্চার ফসলের মূল্যায়ণের জন্যে অধ্যাপক হার্ডির কাছে যখন প্রথম চিঠি লেখেন, তখন রামানুজন সম্পর্কে হার্ডির মনে হয়তো কিছুটা সংশয় ও দ্বিধা জেগেছিল। কিন্তু তিনি যখন রামানুজনের গণিত সংক্রান্ত নিবন্ধগুলির গভীরে প্রবেশ করলেন, তখন তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইলো না—এ যে এক অনন্য গণিত-প্রতিভা! তিনি সংকল্প করলেন—তাঁর এই অসাধারণ পত্র-প্রেরককে যত শীঘ্র সম্ভব

মাদ্রাজের অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে সরিয়ে কেম্‌ব্রিজের সুখময় মননশীলতার পরিবেশে আনতে হবে।

তাঁর এই সংকল্পকে বাস্তবায়িত করতে হার্ডিকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তবু তিনি হাল ছাড়েন নি। বাধা এসেছিল প্রধানত রামানুজনের দিক থেকে—ধর্মীয় সংস্কারের বাধা, আর্থিক অনটনের বাধা। এসব বাধা দূর করতে হার্ডি চেষ্টার ত্রুটি রাখেন নি। কারণ রামানুজনের মধ্যে যে অনন্য গণিত-প্রতিভার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, তাকে অবহেলায় ঔদাসিন্যে অপচিত হতে দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

হার্ডির সঙ্গে এই যোগাযোগ রামানুজনের জীবনে এক পরম আশীর্বাদস্বরূপ। রামানুজন তাই হার্ডিকে তাঁর পরম সুহৃদ, উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক রূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হার্ডি ছিলেন এক অসাধারণ গণিতজ্ঞ এবং তত্ত্বীয় গণিতের পিতৃ-পুরুষস্বরূপ। ১৮৭৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা-বাবার দুই সন্তানের মধ্যে তিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ, বোন ছিলেন তাঁর চেয়ে ২ বছরের ছোট। তাঁর মা-বাবা উভয়েরই গণিতের প্রতি গভীর অনুরাগ ছিল এবং তাঁরা উভয়েই ছিলেন শিক্ষক। উইনচেস্টারে প্রাথমিক শিক্ষার পর হার্ডি উচ্চতর শিক্ষার জন্যে কেম্‌ব্রিজে যান এবং সেখানকার ট্রিনিটি কলেজে ১৮৯৮ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ফেলোরূপে ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি এই কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি অক্স-ফোর্ডে জ্যামিতির স্যাভিলিয়ান অধ্যাপকপদে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রিনস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিট্যুট অফ টেকনোলজি-তে পরিদর্শক-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে তিনি কেম্‌ব্রিজে ফিরে এসে বিশুদ্ধ গণিতের স্যাড্‌লেরিয়াম অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং এই পদ থেকে ১৯৪২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন এবং দেশবিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয়

ও বিদ্বৎ সমাজ থেকে সম্মানিক ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৪৭ সালের পয়লা ডিসেম্বর যেদিন তাঁকে রয়েল সোসাইটির সর্বোচ্চ সম্মান কোপলে পদক দানের কথা ছিল সেইদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি ছিলেন চিরকুমার। হার্ডি যেমন দেখতে সুন্দর ছিলেন, তেমনি তাঁর আচার-আচরণও ছিল মধুর। তাঁর কতকগুলি দৃঢ় ধারণা ছিল—তার মধ্যে কিছু ছিল প্রশংসাযোগ্য, আবার কিছু কিছু ছিল অদ্ভুত। যুদ্ধের প্রতি তাঁর ছিল গভীর বিতৃষ্ণা এবং এ কারণে ফলিত গণিতচর্চাকে (যেমন গতিনিয়ন্ত্রণবিদ্যা বা বায়ু-গতিবিদ্যা) কুৎসিত ও অসহনীয় নীরস বলে মনে করতেন। এদিক থেকে রামানুজনও সম-মনোভাব পোষণ করতেন। যুদ্ধের প্রতি রামানুজনেরও ছিল তীব্র ঘৃণা। যুদ্ধসংক্রান্ত কোনো গাণিতিক সমস্যা তাঁকে দেওয়া হলে তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করতেন।

বিশুদ্ধ গণিতজ্ঞ বলতে যা যথার্থ বোঝায় হার্ডি ছিলেন পুরোপুরি তা-ই। গণিতের ফলিত দিকে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি যে গণিতচর্চা করছেন, ব্যবহারিক দিক থেকে তার কোনো উপযোগিতা আছে কিনা তা নিয়ে তিনি একেবারই মাথা ঘামাতেন না। তাঁর নিজের কথায় বলতে গেলে—"আমি কখনও এমন কিছু করি নি, যার কোনো উপযোগিতা আছে। আমি এমন কোনো গাণিতিক আবিষ্কার করি নি, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের ইষ্ট বা অনিষ্ট করতে পারে, পৃথিবীর কোনো সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্যে তো নয়ই। আমি শুধু গণিতজ্ঞদের শিক্ষাদানে সহায়তা করেছি—যাঁরা ছিলেন আমার মতো একই পথের পথিক এবং যাঁদের গণিতচর্চা আমার মতোই ছিল নিতান্ত অকেজো। ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে আমার গাণিতিক জীবনের কোনো মূল্যই নেই এবং গণিতচর্চা ছাড়া এই জীবন নগণ্য। আমার জীবনের কোনো মূল্যই থাকত না, যদি না আমি কিছু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি করেছি বলে বিবেচিত হতুম। আমি যে কিছু সৃষ্টি করেছি তা অস্বীকার করা যাবে না, তবে প্রশ্ন উঠতে পারে সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আমার বা আমার মতো গণিতজ্ঞদের ক্ষেত্রে যা বিবেচ্য তা হলো বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু সংযোজন করেছি এবং অন্যান্যদের আরো কিছু সংযোজন করতে সহায়তা করেছি। পূর্বসূরী মহান গণিতজ্ঞ, বা ছোট-বড় যে কোনো শিল্পী—যাঁরা কিছু স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন, তাঁদের সৃষ্টি থেকে আমাদের সৃষ্টির মূল পার্থক্য শুধু পরিমাণগত বিচারে, গুণগত বিচারে নয়।"

ধর্মীয় বিশ্বাসে হার্ডি ছিলেন নাস্তিক, পক্ষান্তরে রামানুজন ছিলেন গভীর ধর্মানুরাগী। হার্ডি বলতেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে। কথাটা তিনি ঠাট্টাচ্ছলে বলতেন বটে, কিন্তু তাঁর এই উক্তির পেছনে কিছুটা সত্যতাও ছিল। তিনি কখনও কোনো ধর্মস্থানে প্রবেশ করতেন না, এমন কি নতুন কলেজের ওয়ার্ডেন নির্বাচন উদ্দেশ্যেও নয়। এজন্যে কলেজের বিধিতন্ত্রের উপধারার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে তিনি প্রক্সির মাধ্যমে তিনি কর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন।

অপর পক্ষে রামানুজন ছিলেন প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাসী। গৃহের ইষ্টদেবী নামকালের প্রতি ছিল তার গভীর শ্রদ্ধা। হিন্দু পুরাণের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ এবং রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্যের আলোচনা-সভায় তিনি নিয়মিত যোগদান করতেন। পরম ব্রহ্মের অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং যথাযথ ধর্মীয় প্রণালী ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরত্ব লাভ করা যায় বলে মনে করতেন। ইহ ও পর জীবনের সমস্যা সম্পর্কে তাঁর কতকগুলি বদ্ধমূল ধারণা ছিল এবং মৃত্যু আসন্ন জেনেও তাঁর এই ধারণাগুলি শিথিল হয় নি।

রামানুজন ও হার্ডির মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা গণিতের ইতিহাসে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিক্ষাদীক্ষা ও পরিবেশের বিচারে দুই বিপরীত মেরুর এই দু জন মানুষ কিভাবে নিবিড় সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়! হার্ডি ছিলেন গণিতে উচ্চশিক্ষিত আর রামানুজনের

গণিতে উচ্চ শিক্ষা বলতে কিছুই ছিল না—স্বায়ত্ত শিক্ষার বলে তিনি উচ্চগণিতের রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু হার্ডির কাছে রামানুজনের শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্ন ছিল গৌণ, তিনি রামানুজনের মধ্যে যে অনন্য ও অননুকরণীয় মৌলিকত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন তাতেই বিমুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই রামানুজনের গবেষণায় সাগ্রহে সহ-যোগিতার হস্ত প্রসারিত করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি।

রামানুজনের চেয়ে হার্ডি ছিলেন দশ বছরের বড় এবং ট্রিনিটি কলেজে রামানুজনের ভর্তির ব্যাপারে তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। তাই তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে হার্ডি ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন।

রামানুজন যখন কেম্‌ব্রিজে এসে পৌঁছলেন, তখন হার্ডি তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন। কিন্তু তিনি তাঁর ইতিকর্তব্য সম্পাদনে যথাযোগ্য পরিচয় দিতে পেরেছিলেন এবং প্রতিভাধর ছোট ভাই হিসাবেই রামানুজনকে প্রতিপালন করে-ছিলেন। হার্ডির নিজের কথায় বলতে গেলেঃ "রামানুজনকে নিয়ে এক কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল আমাকে। আধুনিক গণিতে তাঁকে কিভাবে শিক্ষিত করে তুলব? গণিতের কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অতি সীমিত, আবার কোনে কোনো বিষয়ে (যার চর্চায় তিনি ছিলেন বিশেষ আগ্রহী) তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। এমন একজন মানুষকে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা, গোড়া থেকে নতুন করে গণিতে পাঠ দেওয়া অসম্ভব। আমার নিজের মনেই একটা সংশয় ছিল, যদি আমি তাঁকে কোনো বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলার দিকে জোর দিই, তা হলে হিতে বিপরীতই হবে। আমার কথা রাখবার জন্যে তিনি হয়তো সে বিষয়ে পাঠ নেবেন, কিন্তু তাতে তাঁর আত্মবিশ্বাস ও আত্মমগ্ন হয়ে গণিত চর্চার আগ্রহ শিথিল হয়ে যাবে। অপরদিকে এমন কতকগুলি বিষয় ছিল যাতে তাঁকে অজ্ঞ রাখাও ছিল অপরাধের সামিল। তাই আমি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিলুম

এবং কিছু পরিমাণে সফলও হয়েছিলুম। কিন্তু আমি তাঁকে যতটা শেখাতে পেরেছিলুম, তার চেয়ে অনেক বেশি নিজে শিখতে পেরেছিলুম তাঁর কাছ থেকে।" এমন অকপট স্বীকৃতি হার্ডির মতো মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

হার্ডির সহৃদয় ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সহযোগিতার ফলেই রামানুজন কেম্‌ব্রিজে এসে তাঁর গণিতচর্চার ক্ষেত্রে অনেকখানি অগ্রসর হতে পেরেছিলেন এবং তাঁর অনন্য গণিতপ্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে-ছিলেন। রামানুজন তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে গণিতচর্চা করেছিলেন, কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে হার্ডির সঙ্গে সহযোগিতা করতে কখনও পরাঙ্মুখ হন নি। উভয়েই পরস্পরকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন এবং তাঁদের যৌথ গবেষণার ফলে গণিতের ক্ষেত্রে বহু মূল্যবান অবদান সংযোজিত হয়েছে।

রামানুজন এবং হার্ডির এই অনন্যসাধারণ সহযোগিতা মাত্র ৫ বছর কাল স্থায়ী হয়েছিল (বিধির বিধানে তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি)। স্বল্প কালের এই স্বর্ণপ্রসূ সহযোগিতার ফলে গণিতের ক্ষেত্রে যে সোনার ফসল আমরা পেয়েছি তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। আর অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে বিশ্বখ্যাতির আলোকতোরণে রামানুজনের উত্তরণে হার্ডির সুমহান সহযোগিতার কথা ভারতবাসী হিসাবে আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব শুধু আজ নয়, কাল নয়, অনন্ত কাল!

রামানুজন ছিলেন গভীর ধর্মানুরাগী আর হার্ডি ছিলেন প্রগাঢ় যুক্তিবাদী, অথচ এই দুটি 'অসম মন' কি করে নিবিড় সহযোগিতায় আবদ্ধ হয়েছিলেন এ প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে জাগবে। এ প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে, যাঁরা প্রকৃত সত্য-সাধক তাঁদের কাছে সত্যের অনুসন্ধানই একমাত্র বিবেচ্য, অন্য সবকিছু গৌণ। রামানুজন এবং হার্ডি উভয়েই ছিলেন সত্যের একনিষ্ঠ সাধক। তাই পরস্পরের মনোবীণার তারটি এক সুরে বেঁধে নিতে অসুবিধা হয় নি তাঁদের। এই মহান সহযোগিতার

প্রদীপ্ত আলোকশিখা উত্তরসূরীদের স্বার্থশূন্য একনিষ্ঠ সত্য-সন্ধানে পথ দেখাবে ও প্রেরণা সঞ্চার করবে সর্বসময়।

রামানুজন ও হার্ডির এই মহান সহযোগিতা আমাদের দেখিয়ে দেয়, মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সংস্কার-রাজনীতি সব কিছুর উর্ধ্বে। তাই বিশ্বের গণিতরাজ্যে একসূত্রে গাঁথা এমন দুটি মহারত্ন আমরা পেয়েছি, যার প্রকৃত মূল্যায়ণ আজও সম্ভব হয় নি।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

১৯১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি রামানুজন 'নাগোয়া' জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ডের তীরভূমি ছেড়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। একমাস সমুদ্রযাত্রার পর তিনি বোম্বে বন্দর এসে পৌঁছান। সেখানে তাঁর মা ও ভাই তাঁকে নিতে আসেন। তিন সপ্তাহ বোম্বেতে কাটিয়ে ২ এপ্রিল তিনি মাদ্রাজে উপনীত হন। পাঁচ বছরেরও বেশি ইংল্যাণ্ডে কাটিয়ে তিনি স্বদেশে ফিরে এলেন বিশ্বজোড়া খ্যাতি নিয়ে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহীরা রামানুজনকে তাঁদের মধ্যে ফিরে পেয়ে স্বভাবতই পরম আনন্দিত হয়েছিলেন।

রামানুজন স্বদেশে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় গণিত সমিতি তাঁদের পয়লা এপ্রিলের সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। প্রস্তাবে বলা হয়ঃ "প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজন, এফ. আর. এস. দীর্ঘকাল কেমব্রিজে থাকবার পর অসুস্থ শরীরে মাদ্রাজে ফিরে এসেছেন। তাঁর অনন্য গণিত-প্রতিভা ও মূল্যবান মৌলিক অবদানের দ্বারা তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। আমরা তাঁকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং একান্তভাবে প্রার্থনা করি তিনি স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে পূর্ণ উদ্যমে বিজ্ঞানজগতে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল কাজ সম্পাদন করুন।"

এর ৪ মাস পরে ভারতীয় গণিত সমিতি তাঁদের পয়লা আগস্টের সভায় রামানুজনকে সম্মানীয় সদস্যরূপে নির্বাচিত করে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে রামানুজন মাদ্রাজে ফিরে আসার পর তাঁর আত্মীয়পরিজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মাদ্রাজে তিনি ৩ মাস ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হলো

না। তখন তাঁর জন্মস্থানের কাছাকাছি কাবেরী নদীর তীরবর্তী কোড়ুমুডি গ্রামে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি দু মাস ছিলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা ভেবেছিলেন নদীর তীরবর্তী স্থানে গিয়ে রামানুজনের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু সেখানে দু মাস থাকবার পরও তাঁর স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হলো না, বরং আর্দ্র আবহাওয়ায় তাঁর অবস্থা আরও খারাপের দিকে যেতে লাগলো। তখন তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জায়গা তাঞ্জাভুরে যাবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ করেন। তাঁদের এই প্রস্তাব শুনে তিনি 'তাঞ্জাভুর' কথাটিকে তিনটি অংশে অর্থাৎ 'তান, সাভু এবং উর' ভাগ করে তাঁর স্ত্রীকে বলেন : 'ওরা আমাকে তান-সাভু-উর-এ (তামিলে যার অর্থ মৃত্যুর স্থান) নিয়ে যেতে চাইছে।' শেষ পর্যন্ত তিনি কুম্ভকোনমে যেতে সম্মত হলেন। সেখানেও তাঁর স্বাস্থ্যের তেমন কোনো উন্নতি হলো না। স্থানীয় বহু চিকিৎসক তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্যে শীঘ্রই তাঁকে মাদ্রাজে নিয়ে যেতে বললেন। রামানুজন প্রথমে রাজী হন নি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবেরা অনেক বোঝাবার পর শেষ পর্যন্ত মাদ্রাজে যেতে তিনি রাজী হলেন।

১৯২০ সালে জানুয়ারীর গোড়ায় রামানুজনকে মাদ্রাজে নিয়ে আসা হলো এবং তাঁর জন্যে যতদূর সম্ভব সর্বোত্তম চিকিৎসা-ব্যবস্থা করা হলো। এই সময় কয়েকজন মহানুভব ব্যক্তি তাঁর চিকিৎসার জন্যে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এবং রাও বাহাদুর নাম্বেরুমল চেট্টি। শ্রীআয়েঙ্গার এই সময় রামানুজনের চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন এবং শ্রীচেট্টি বিনাভাড়ায় তাঁর নিজস্ব বাড়িটি রামানুজনের জন্যে ছেড়ে দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্যরাও রামানুজনের প্রতি তাঁদের কর্তব্য পালনে পশ্চাদ্‌পদ হন নি। তাঁরা প্রত্যেকে রামানুজনের যথোপযুক্ত চিকিৎসাব্যবস্থার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে অর্থদান করেন। মাদ্রাজের যে অঞ্চলে শ্রীচেট্টির আবাসে রামানুজনকে রাখা হয়েছিল, সে অঞ্চলটি 'চেতপেট'

নামে পরিচিত। তাই রামানুজন তাঁর স্ত্রীকে ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলেন: 'ওঁরা আমাকে চেতপেট-এ নিয়ে এসেছেন, যেখানে সব কিছুই হয় চেত-পা (তামিল বা হিন্দীতে যার অর্থ হলো চটপট)।' রামানুজন কি তাঁর প্রয়াণের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন।

মাদ্রাজে এসে শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও রামানুজনের গণিতচর্চায় ভাঁটা পড়ে নি। মাদ্রাজে আসবার কয়েকদিন পরেই তিনি তাঁর গণিতচর্চার বিষয়ে অধ্যাপক হার্ডিকে চিঠি লিখেছেন। কিন্তু তাঁর শরীরের অবস্থা দিনের দিন খারাপ হতে লাগলো। তাঁর অমূল্য জীবনরক্ষার জন্যে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ সকলের সর্বপ্রকার চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। ১৯২০ সালের ২৬ এপ্রিল মাদ্রাজের উপকণ্ঠে চেতপেটের বাসভবনে আধুনিক বিজ্ঞানজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ রামানুজন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

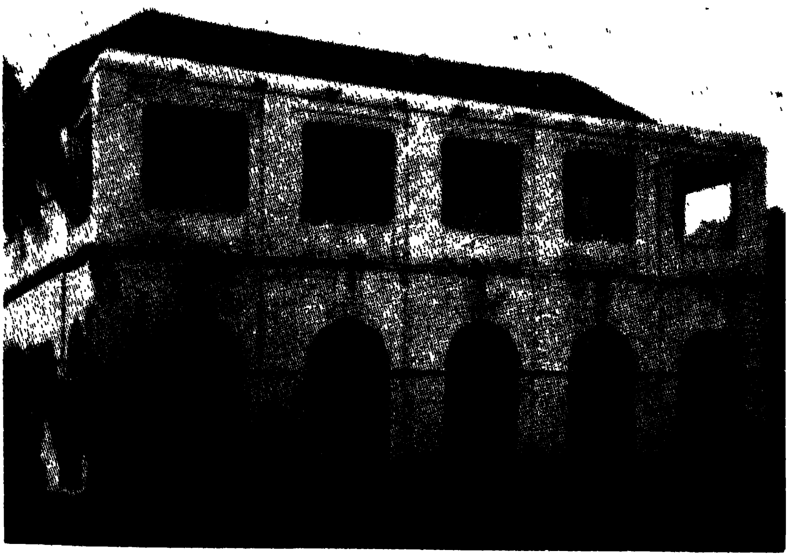
রামানুজনের তিরোধানের সঙ্গে ভারত তথা বিশ্বের গণিতাকাশ থেকে একটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক খসে গেল। বিরাট সম্ভাবনাময় একটি প্রতিভাদীপ্ত জীবনের এই অকাল নির্বাপণ শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে এক অপূরণীয় ক্ষতি হিসাবে চিরকালের জন্যে চিহ্নিত হয়ে রইলো।



ইংল্যাণ্ডে রামানুজন



কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ—যেখানে রামানুজন পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন



মাদ্রাজের চেতপুটের আবাস—যেখানে রামানুজন জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন

গাণিতিক অবদান

রামানুজনের গাণিতিক অবদানের যথার্থ পরিচয় সাধারণের কাছে তুলে ধরা অতীব দুরূহ। কারণ উচ্চ গণিতের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। গণিতের যে সকল জটিল বিষয়ে রামানুজন তাঁর অনন্য-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, তার গভীরে প্রবেশ করে মর্মোদ্ধার করা গণিত-অনভিজ্ঞদের তো দূরের কথা, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছাড়া গণিতের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেও অসম্ভব। তাই এখানে জটিল গাণিতিক বিষয়ে অগ্রসর না হয়ে আমরা সাধারণভাবে রামানুজনের গণিত-প্রতিভার মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হব।

গণিতে 'সর্বোত্তম সত্য' কি তা জানার জন্যে ছোটবেলা থেকেই রামানুজনের মনে একটা প্রবল ঔৎসুক্য ছিল। যখন সে স্কুলের ছাত্র, তখন সহপাঠীদের কাছে এ প্রশ্ন সে প্রায়ই উত্থাপন করত এবং উঁচু ক্লাশের বন্ধুদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলত, 'পিথাগারাস সূত্র' হচ্ছে গণিতে সবচেয়ে বড় সত্য। আবার কেউ কেউ বলত—স্টক-শেয়ার হচ্ছে সর্বোত্তম সত্য। এ-সব উত্তরে রামানুজনের মন কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারত না। তার মন চাইত, সর্বোত্তম সত্যকে খুঁজে বার করতেই হবে। এই অনুসন্ধিৎসার আগ্রহে রামানুজনের অঙ্কের নেশা আরও প্রবল হয়ে উঠল। এই আরও জানার তাগিদে সে একের পর এক অঙ্কের বই শেষ করতে লাগল। কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজে অঙ্কের বই ছিল প্রচুর। তার কলেজের বন্ধুরা সে যা বই চাইত তা-ই তাকে এনে দিত। এসব বই আদ্যোপান্ত পড়েই সে ক্ষান্ত হত না। কারো

কোনো সাহায্য না নিয়েই বই-এর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সে নিজে কষে বার করত।

রামানুজন যখন মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র, সেই স্বল্প বয়সেই সে সমান্তর ও গুণোত্তর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য আয়ত্ত করে। যখন সে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, তখন ত্রিকোণমিতি বিষয়ে পড়াশোনা করতে থাকে। তার পাশের বাড়ির একজন বি-এ ক্লাশের ছাত্র লোনীর ত্রিকোণমিতির দ্বিতীয় ভাগের একটি বই তাকে এনে দেয়। কয়েকদিন পরে রামানুজনের কাছে এসে সে জানতে পারে, চতুর্থ শ্রেণীর এই মেধাবী ছাত্রটি বি-এ ক্লাশের বই শুধু পড়েই শেষ করে নি, তার প্রতিটি অঙ্ক সে নিজে নিজেই কষে ফেলেছে। রামানুজনের এই অসাধারণ গণিত-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না। এরপর থেকে গণিতের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্যে রামানুজনের কাছে সে প্রায়ই ছুটে আসত। শুধু এই বি-এ ক্লাশের ছাত্রটি নয়, উঁচু ক্লাশের আরও অনেক ছাত্র এই একই উদ্দেশ্যে তার কাছে আসত। কিন্তু তার মা-বাবা বাড়ির বার হওয়া পছন্দ করতেন না বলে রামানুজন রাস্তার ধারের একটি জানালার কাছে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলত।

পঞ্চম শ্রেণীতে পড়বার সময় রামানুজন প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার উদ্ভাবিত সাইন ও কোসাইন-এর সূত্রগুলি নিজে নিজেই কষে বার করে। পরে যখন সে জানতে পারলো এই সূত্রগুলি ইতিপূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে, তখন তার অঙ্ক-কষা খাতার পাতাগুলো ছিঁড়ে বাড়ির ছাদে ছড়িয়ে দিল।

১৯০৩ সালে রামানুজন তখন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছে। সে সময় একদিন তার এক বন্ধু স্থানীয় সরকারী কলেজ থেকে কার রচিত 'বিশুদ্ধ ও ফলিত গণিতের সংক্ষিপ্তসার' (A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics) বইটি চেয়ে এনে রামানুজনকে দেয়। এই দিনটি রামানুজনের প্রতিভাদীপ্ত জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এর মতো

এই দিনটিতে একটি নতুন জগতের দ্বার তার কাছে খুলে যায়। এই জগতে প্রবেশ করে তার আনন্দের সীমা রইলো না। যে অনন্য গণিত-প্রতিভা এতদিন তার মধ্যে সুপ্ত ছিল, এই বইটির যাদুস্পর্শে তা যেন জেগে উঠলো।

কার-এর বইটিতে গণিতের যে সমস্ত সূত্র ছিল, রামানুজন তা বুদ্ধি খাটিয়ে প্রমাণ করবার জন্যে মেতে উঠলো। অন্য যেসব বই-এর সাহায্যে এই সূত্রগুলি প্রমাণ করা যায়, তার কোনোটিই রামানুজনের কাছে তখন ছিল না। তাই প্রত্যেকটি সূত্র তার কাছে গবেষণার বস্তু হয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে সে সংখ্যার বিচিত্র বর্গ (Magic Square) তৈরীর কয়েকটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করলো। তারপর জ্যামিতির দিকে তার মন আকৃষ্ট হয়।

বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান একটি বর্গক্ষেত্র কিভাবে তৈরী করা যায় তার চেষ্টায় সে মনোনিবেশ করলো। অর্থাৎ রামানুজন এমন একটি জ্যামিতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের চেষ্টা করতে চাইলো, যার সাহায্যে একটি বৃত্ত ও ব্যাস নিয়ে শুরু করে এমন আয়তনের সরল-রেখা বার করা যার, যায় ওপর বর্গক্ষেত্র হবে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সমান। এভাবে সে ক্রমশ উন্নততর পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে লাগলো। তার শেষ পদ্ধতিটি এত উন্নত হয়েছিল যে, পৃথিবীর বৃত্তের আয়তনের সমান (যার ব্যাস হচ্ছে ৮০০০ মাইল) ধরে এমন একটি বর্গক্ষেত্রের বাহু বার করা গেল, যা হলো পৃথিবীর বিষুব বৃত্তের প্রকৃত পরিধির (৭০৯০ মাইল) প্রায় কাছাকাছি। রামানুজনের উদ্ভাবিত ফলে ও প্রকৃত দৈর্ঘ্যে তারতম্য হয়েছিল মাত্র কয়েক ফিট।

জ্যামিতির মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কারের তেমন সুযোগ নেই দেখে রামানুজন এরপর বীজগণিতে মনোনিবেশ করলো। এই বীজগণিতের মধ্যেই সে তার প্রতিভা স্ফুরণের উপযুক্ত পথ খুঁজে পেলো। নাওয়া-খাওয়া-শোয়া ভুলে বীজগণিতের নতুন নতুন সূত্র আবিষ্কারের সাধনায় সে তার সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিল। এসময় সে গণিতের স্বপ্নও দেখত। রামানুজন বলত, জটিল গাণিতিক

সমস্যার সমাধান বার করতে না পেরে সে যখন চিন্তাকুল হত, তখন দেবী নামগিরি তাকে স্বপ্নে সে সমস্যা সমাধানের সঙ্কেত দেখিয়ে দিতেন। রামানুজন সত্যসত্যই প্রায় প্রতিদিন বিছানা ছেড়ে উঠেই গাণিতিক সমস্যার ফলাফল লিখত ও সেগুলো যাচাই করে দেখত। একটি বাঁধানো নোট-বই-এ সে তার এইসব ফলাফল লিখে রাখত এবং যাঁরা তার গণিতের কাজে আগ্রহ প্রকাশ করতেন, তাঁদের এই নোট বইটি সে দেখতে দিত। পরবর্তীকালে গণিতজ্ঞেরা এই নোট বই-এ রামানুজনের অনন্য-সাধারণ গণিতপ্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ছিলেন।

একটা প্রশ্ন আমাদের অনেকেরই মনে জাগে—রামানুজনের প্রতিভার কি কোনো বিশেষ রহস্য ছিল? গাণিতিক সমস্যার সমাধানে তিনি কি অন্যান্য গণিতজ্ঞদের মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করতেন? তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে সত্যই কি কোনো অসাধারণত্ব ছিল? রামানুজনের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হার্ডিও বহুবার এই সব প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, এসব প্রশ্নের সদুত্তর তিনি দিতে পারেন না। তবে তাঁর বিশ্বাস, অন্যান্য গণিতজ্ঞদের মতো রামানুজনও সমস্যার গভীরে একইভাবে চিন্তা করতেন। কিন্তু রামানুজনের স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি যেভাবে মুহূর্তের মধ্যে জটিল গাণিতিক সংখ্যা ও তার বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতেন তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যেত না।

রামানুজনের গণিতপ্রতিভার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে অধ্যাপক হার্ডি তাই বলেছেন: 'রামানুজন তাঁর স্মৃতিশক্তি, ধৈর্য ও গণনা-শক্তির সাহায্যে এমন সাধারণীকরণের ক্ষমতা, রূপায়ণের অনুভূতি এবং কল্পনা দ্রুত পরিবর্তনের ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন যা সত্য-সত্যই বিস্ময়কর এবং তাঁর নিজস্ব বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁকে সমসাময়িক গণিতজ্ঞদের মধ্যে অদ্বিতীয় করেছিল।'

রামানুজনের গাণিতিক অবদানের কথা আলোচনা করতে গেলে সংখ্যাতত্ত্বের (Theory of Numbers) বিষয় সর্বপ্রথমে উল্লেখ

করতে হয়। কারণ সংখ্যাতত্ত্বেই তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান। সংখ্যাতত্ত্বে কয়েকটি জটিল ত্রিকোণমিতিক যোগশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তার একটিকে বলা হয় 'রামানুজন যোগক্রম।' গণিতশাস্ত্রে এই সব যোগশ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব যে কত গভীর তা রামানুজনই প্রথম উপলব্ধি করেন। সংখ্যাতত্ত্বের বিভিন্ন সমস্যায় এগুলির সুনিপুণ ও সুসম প্রয়োগের কৃতিত্ব তাঁরই। কোনো সংখ্যাকে কতকগুলি সংখ্যার বর্গের যোগফলে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর এই প্রয়োগের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়ে থাকে।

সংখ্যাতত্ত্বে রামানুজনের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার বিভাজন বা 'পার্টিশন' (Partition) সম্পর্কে। এখানে 'পার্টিশন' বলতে কি বোঝায় তা একটু বিশদভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা ৫-কে ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার যোগফল হিসাবে সাত রকমে আমরা লিখতে পারি। যেমন:

৫, ৪+১, ৩+২, ৩+১+১, ২+২+১, ২+১+১+১, ১+১+১+১+১

অনুরূপভাবে ৪-কে আমরা লিখতে পারি পাঁচ রকমে। যেমন:

৪, ৩+১, ২+২, ১+১+২, ১+১+১+১

গণিতের ভাষায় এই ধরনের বিভাজনকে বলা হয় 'পার্টিশন'।

সংখ্যাতত্ত্বে এই পার্টিশন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন গণিতজ্ঞদের গবেষণার নানা সূত্র উদ্ভাবিত হলেও বিভাজনের মোট সংখ্যার গাণিতিক ধর্ম সম্পর্কে খুব কমই জানা গেছে। যেমন, কোনো ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার মোট পার্টিশন যুগ্ম, না অযুগ্ম হবে তা এখনও জানা যায় নি। তবে সত্যিকার যে কয়েকটি গাণিতিক ধর্ম জানা গেছে সেগুলির উদ্ভাবক হলেন রামানুজন। এ বিষয়ে তাঁর মূল্যবান গবেষণাটি কেমব্রিজ দার্শনিক সমিতির বিবরণীতে 'পার্টিশন-সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম' শীর্ষক নিবন্ধে প্রকাশিত হয়। পার্টিশনের অনেকগুলি ধর্মের প্রমাণ রামানুজন দিয়েছিলেন, তার মধ্যে তিনটি বিশেষ

আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ঐ তিনটি প্রমাণ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক হার্ডি বলেছিলেন :

'ঐ তিনটি গাণিতিক প্রমাণের মধ্যে এমন একজন মানুষের সাধনার বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে যিনি নিঃসন্দেহে অন্ততঃ শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞরূপে বিবেচিত হবেন।'

বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতকে গণিত-শাস্ত্রে গ্রীক অক্ষর 'পাই' (π) দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এর মান সব সময় স্থির থাকে বলে একে গণিতশাস্ত্রে ধ্রুবক বলা হয়। গণিতশাস্ত্রে এরকম অনেক ধ্রুবক আছে। পাই-এর মান ২২/৭ বা প্রায় ৩·১৪৩৬। আর্কিমিডিস, টলেমি থেকে শুরু করে আধুনিক কালের বহু গণিতজ্ঞ নানা উপায়ে পাই-এর মান নির্ণয় করেছেন। এমন কি সম্ভাব্যতা তত্ত্বের সাহায্যেও পাই-এর মান নির্ণয় করা হয়েছে। রামানুজনও নিজস্ব পদ্ধতিতে পাই-এর মান নির্ণয় করেন। পাই-এর বীজগাণিতিক আসন্ন মানস্বরূপ তিনি যে সমস্ত ক্রম নির্ণয় করেন তা গণিতজ্ঞের দৃষ্টিতে খুবই অভিনব।

সংখ্যাতত্ত্বে রামানুজনের আর একটি মূল্যবান সংযোজন হচ্ছে 'অতি-সংযুক্ত সংখ্যা' (Highly composite Number) সম্পর্কিত গবেষণা। ৬ সংখ্যাটির ভাজক হচ্ছে ৪টি। যেমন—১, ২, ৩, ৬ এবং ১২-র ভাজক হচ্ছে ৬টি ১, ২, ৩, ৪, ৬, ১২। কোনো সংখ্যার ভাজক-সংখ্যা যদি তার পূর্ববর্তী কোনো সংখ্যার ভাজক-সংখ্যা অপেক্ষা বেশি হয়, তা হলে সেই সংখ্যাটিকে 'হাইলি কম্পোজিট নাম্বার' বলা হয়। যেমন ৩৬-এর ভাজক সংখ্যা হচ্ছে ৯টি কিন্তু ৩৫-এর ভাজক-সংখ্যা ৪টি এবং ৩৪-এরও ভাজক-সংখ্যা ৪টি এজন্যে ৩৬ সংখ্যাটি একটি 'হাইলি কম্পোজিট নাম্বার'। কিন্তু ৪০ সংখ্যাটি হাইলি কম্পোজিট নাম্বার নয়। কারণ ৪০-এর ভাজক সংখ্যা হচ্ছে ৮টি। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত লণ্ডনের গণিত সমিতির পত্রিকায় রামানুজন তাঁর 'হাইলি কম্পোজিট নাম্বার' শীর্ষক নিবন্ধে যে দুরূহ ও বিস্তৃত গবেষণার পরিচয় দেন, তা গণিতশাস্ত্রে এ

হামূল্য অবদান হিসাবে স্বীকৃত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে অধ্যাপক ার্ডি লিখেছিলেন: 'অসমতার বীজগণিতে রামানুজনের কি সাধারণ দক্ষতা ছিল তা এই গবেষণাই প্রমাণ করে।'

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় গণিতজ্ঞদের মতে রামানুজনের প্রতিভার শ্রষ্ঠ স্ফুরণ ঘটেছিল পার্টিশন তত্ত্বে, উপবৃত্তীয় অপেক্ষক এবং ক্রমিক গ্নাংশের গবেষণায়। 'বিভাজন সংখ্যার কয়েকটি ধর্ম', 'সমবায়িক বশ্লেষণে কয়েকটি অভেদের প্রমাণ' এবং 'বিভাজনের সর্বসম ধর্ম' ার্ষক গবেষণানিবন্ধ তিনটি তাঁর অনন্য গণিতপ্রতিভার উজ্জ্বল নদর্শন। অধ্যাপক হার্ডি বলেছেন: 'সমবায়িক বিশ্লেষণে কয়েকটি অভেদের প্রমাণ' শীর্ষক গবেষণাপত্রে যে 'রোজার্স-রামানুজন অভেদটি প্রমাণিত হয়েছে, তার চেয়ে সুন্দর সূত্র খুঁজে পাওয়া ঠিন'। সেই সঙ্গে হার্ডি এ কথাও বলতে দ্বিধা করেন নি যে, াক্ষেত্রে রামানুজনের স্থান রোজার্স-এর পরে।

ঐ গবেষণানিবন্ধে যে দুটি অভেদ প্রমাণিত হয়েছে তা প্রথম াবিষ্কার করেন রোজার্স এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন গণিত সমিতির াত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়। সে সময় রামানুজনের বয়স মাত্র ৭ াছর। এর কুড়ি বছর পরে রামানুজন স্বতন্ত্রভাবে ঐ দুটি অভেদ ুনরাবিষ্কার করেন। তখন রোজার্স-এর গবেষণার কথা রামানুজন একেবারেই জানতেন না। তবে রামানুজন সে সময় সূত্র দুটির কানো প্রমাণ দিতে পারেন নি। আরোহ পদ্ধতিতে সূত্র দুটি পয়ে তিনি ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অধ্যাপক হার্ডিকে এ বিষয়ে জানান। হার্ডি আবার ঐ সূত্র দুটির কথা মেজর ম্যাক-মাহন এবং অধ্যাপক পেরোঁকে জানিয়ে দেন। তাঁরা কেউই কিন্তু এর কোনো প্রমাণ দিতে পারেন নি। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর তিনটি প্রমাণ প্রকাশিত হয়। তার একটি প্রমাণ দেন রোজার্স নিজে এবং অপর দুটি প্রমাণ দেন স্ট্রাসবার্গের অধ্যাপক স্যুব। এরপর যে প্রমাণগুলি প্রকাশিত হয় তা পূর্বপ্রকাশিত প্রমাণ অপেক্ষা সরল ও সুন্দর। এর প্রথমটি জানা যায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে ম্যাক-

মোহনকে লেখা রোজার্স-এর চিঠি থেকে এবং দ্বিতীয়টি জানা যা ঐ বছরের এপ্রিলে হার্ডিকে লেখা রামানুজনের চিঠি থেকে। দুটি প্রমাণ একই তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও প্রমাণপদ্ধতিতে অনেক খানি পার্থক্য দেখা যায়। এই সুন্দরতম সূত্র দুটির সরল সাবলীল প্রমাণে হার্ডি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, অনুরাগী মহে প্রচারের জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট দুজনের অনুমতি নিয়ে নিজেই সেগুলি প্রকাশ করেছিলেন।

রামানুজনের অনন্য গণিতপ্রতিভার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে হার্ডি একটি বিষয়ে বিশেষ বিব্রত বোধ করেছিলেন। সেটা হচ্ছে রামানুজনকে কিভাবে আধুনিক গণিতের সঙ্গে পরিচিত করা যায় হার্ডির আহ্বানে রামানুজন যখন কেমব্রিজে উপনীত হন, তখ তাঁর সঙ্গে গবেষণা করার সময় হার্ডিকে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। হার্ডি বলেছেন: 'রামানুজনের মতো গণিত প্রতিভাকে নিয়মমাফিক শিক্ষা দেওয়া ও গোড়া থেকে গণিতশিক্ষ করতে বলা ধৃষ্টতা। আমি যদি এ ব্যাপারে জোর দিতুম, ত হলে রামানুজন বিরক্ত হতেন এবং তাঁর আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণ নষ্ট হয়ে যেত। পক্ষান্তরে এমন কয়েকটি বিষয় ছিল, যার সম্বন্ধে তাঁর অজ্ঞতা দূর না করাও ছিল অনুচিত। জেটা-ফাংশনের সমস্ত শূন্য বাস্তব বলে তাঁর যে ধারণা ছিল, সেটা বদ্ধমূল হতে দেওয়া ছিল অসম্ভব। তাই আমি তাঁকে এ বিষয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলুম এবং কিছুটা সফলও হয়েছিলুম। তবে আমি তাঁকে শিক্ষা দিতে গিয়ে নিজেই তাঁর কাছ থেকে বেশি শিখেছিলুম।'

ইংল্যাণ্ডে রামানুজন যখন অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে ছিলেন, সে সময় একদিন অধ্যাপক হার্ডি তাঁকে দেখতে আসেন।

রামানুজন তখন হার্ডিকে জিজ্ঞেস করেন: 'আপনি যে ট্যাকসিতে এসেছেন তার নম্বর কত?'

হার্ডি বললেন: 'ট্যাকসির নম্বর হচ্ছে ১৭২৯। এই সংখ্যাটির বোধ হয় কোনো অভিনবত্ব নেই।'

সংখ্যাটি শুনে রামানুজন উদ্ভাসিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে বললেন : "কেন নয়? এটা সত্যি একটা অভিনব সংখ্যা। এটি হচ্ছে এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা, যাকে দুভাবে দুটি ঘনের (cube) যোগফল হিসাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন

$$১৭২৯ = ১২^৩ + ১^৩, \text{ অথবা } ১০^৩ + ৯^৩$$

ভগ্ন শরীরেও রামানুজন গণিতচিন্তায় কত বিভোর হয়ে থাকেন তা দেখে সেদিন হার্ডির বিস্ময়ের সীমা ছিল না। পরবর্তীকালে অধ্যাপক হার্ডি বলতেন, ১০০০০-এর নিচে প্রত্যেকটি সংখ্যার সঙ্গে রামানুজনের যেন ব্যক্তিগত সখ্য ছিল।

কয়েক বছরের মধ্যে রামানুজন ফাংশন-তত্ত্ব এবং সংখ্যা বিশ্লেষণ-তত্ত্ব সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন। তিনি যে সব গাণিতিক সমস্যার সমাধান করেছেন, তা ভুল বা নির্ভুল হোক, সহজাত বুদ্ধি ও আরোহ পদ্ধতিতে মীমাংসা করতেন এবং প্রত্যেকটিতে তাঁর মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যেত।

হার্ডির মতে বীজগণিতের সূত্র, অসীম শ্রেণীর রূপান্তর ইত্যাদিতে রামানুজনের যে গভীর অন্তর্দৃষ্টির নিদর্শন মেলে তা সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কাউকে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র বিশ্বখ্যাত গণিতজ্ঞ অয়লার বা জ্যাকবির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। তিনি কোনোদিনই আধুনিক চিন্তাধারার গণিতজ্ঞ ছিলেন না। আরোহ পদ্ধতিতে তিনি অধিকাংশ আধুনিক গণিতজ্ঞদের চেয়ে অনেক বেশি গাণিতিক গবেষণা করেছিলেন।

একটা কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে, আধুনিক বিশ্লেষণ গণিতের গোড়াপত্তনের সময় কোনো গণিতজ্ঞের পক্ষে মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দেওয়া যত সহজ ছিল, আজকের দিনে তার চেয়ে অনেক কঠিন। একদিক থেকে এই কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য। রামানুজনের কাজের গুরুত্ব এবং ভবিষ্যতের গণিতে তাঁর প্রভাব সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। মহত্তম কাজের মধ্যে যে সরলতা ও

অপরিহার্যতা থাকে তাঁর কাজের মধ্যে তা নেই। কিন্তু তাঁর কাজের একটি গুণ কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। সেটা হচ্ছে তাঁর গভীর ও অনন্য মৌলিকতা। রামানুজন যদি তাঁর যৌবনে গাণিতিক রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হতেন, তা হলে তিনি হয়তো আরও বড় গণিতজ্ঞ হতে পারতেন এবং আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ নতুন আবিষ্কার করতে পারতেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে যে রামানুজনকে আমরা পেতুম, তাঁর মধ্যে এই রামানুজন খুঁজে পাওয়া যেত না এবং একজন ইউরোপীয় অধ্যাপকের প্রতিচ্ছায়া বিশেষভাবে প্রকাশ পেত। তাতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই হত বেশি। আর সেই রামানুজনকে পাই নি বলেই গণিত-জগতে এই রামানুজন একক এবং অনন্য।

মানুষ রামানুজন

আজ বিজ্ঞানজগতে গণিতের যে বিরাট পবিত্র সৌধ গড়ে উঠেছে, তার মূলে আছে বহুজনের একনিষ্ঠ সাধনা ও নিরলস প্রয়াস। যাঁদের অবদানে এই সৌধ গঠিত হয়েছে, তাঁদের প্রধানত চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যাঁরা গণিতচর্চাকে জীবন-নির্বাহের উপায় হিসাবেই গ্রহণ করেন এবং তার কাছ থেকে যতটা পারেন আদায় করেন। তাঁরা গণিতচর্চায় শুধু শ্রম দান করেন, কিন্তু তাঁদের হৃদয় ও মন থাকে অন্যত্র। অন্যান্য ক্ষেত্রে গেলে তাঁরা হয়তো মোটামুটি কাজ চালাতে পারতেন, কিংবা হয়তো মোটেই সুবিধা করতে পারতেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর হচ্ছেন তাঁরা, যাঁরা গণিতকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং গণিতের কাছ থেকে যতটা পেয়েছেন ঠিক ততটাই ফিরিয়ে দিয়েছেন। গণিতে তাঁরা শ্রম ও মন দুই দিয়েছেন। তৃতীয় শ্রেণীর গণিতবিদেরা গণিতচর্চাকে একটা মিশন হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা গণিতের কাছ থেকে যা পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাকে দান করেছেন। গণিতচর্চায় তাঁরা শুধু শ্রমমন দেন নি, হৃদয়ও দান করেছেন। চতুর্থ শ্রেণীর যাঁরা তাঁরা গণিতে শ্রমমন-প্রাণ সবই দিয়ে তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছেন। তাঁরা গণিতের জন্যে সমগ্র সত্তাই উৎসর্গ করেছেন। প্রথম শ্রেণীর মানুষেরা যদি গণিতের ক্ষেত্রে না আসতেন, তা হলে গণিত-সৌধের কোনো কিছুই ক্ষতি হত না। দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিতজ্ঞেরা বিভিন্ন তল স্থাপন করে গণিত-সৌধের উচ্চতা গড়ে তুলেছেন। তৃতীয় শ্রেণীর গণিতজ্ঞেরা সৌধের ভূমি-তল ও বিভিন্ন কক্ষ গঠন করেছেন। কিন্তু সমগ্র গণিতসৌধের অস্তিত্বের

মূলে আছেন চতুর্থ শ্রেণীর গণিতবিদেরা। কারণ তাঁরাই হচ্ছেন গণিতের ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ এবং সর্বকালের জন্যে গণিত-সৌধকে সুদৃঢ় ও নিরাপদ করে গেছেন। তাঁরা নামযশের জন্যে, কখনও আকাঙ্ক্ষা করেন নি, এমন কি অনেক সময় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কাজ করে গেছেন। তাঁরা না থাকলে গণিতের সৌধ কোনো দিনই গড়ে উঠত না। গণিতের ধ্যানধারণা ও অস্তিত্বের জন্যে আমরা তাঁদের কাছে ঋণী।

শ্রীনিবাস রামানুজন ছিলেন গণিতের এই মহান স্রষ্টা, স্থপতি ও পথিকৃৎদের অন্তর্গত। গণিতের বেদীমূলেই তিনি তাঁর জীবনসত্তা উৎসর্গ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন গণিত ও ভৌত-বিজ্ঞানে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে ও জটিলতার যুগ শুরু হয়েছে, তখন রামানুজন তাঁর সামান্য হাতিয়ার নিয়ে দেখিয়ে গেছেন, কি উচ্চ মার্গে গণিত উন্নীত হতে পারে এবং কি বিস্তৃত দিগন্তে তা প্রসারিত হতে পারে।

বস্তুত, অনেকের কাছে আধুনিক যুগে সকল ধ্যানধারণার বাইরে রামানুজন এক পরম বিস্ময়! অধ্যাপক ই. টি. বেল (E. T. Bell) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Men of Mathematics*-এ লিখেছেন: "গণিত-বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত গণিতের রাজ্যে রামানুজনের আবির্ভাবকে বিধাতার দান বলে মনে করেন। অলৌকিক অন্তর্দৃষ্টির বলে তিনি যে সব সূত্র (যা আপাত সম্পর্কশূন্য বলে মনে হয়) উদ্ভাবন করে গেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায়, গণিতের ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তরে কত নতুন পথের সন্ধান তিনি দিয়ে গেছেন। সেই পথ অনুসরণ করে বহু গণিতজ্ঞ অগ্রসর হয়েছেন। জি. এইচ. হার্ডি, জে. ই. লিটলউড, এল. জে. মরডেল, জি. এন. ওয়াটসন, বি. এম. উইলসন, ডি. এইচ. লেহমার, এস. নারায়ণ আয়ার, এস. এস. পিল্লাই, এইচ. গুপ্তা, এস. চাওলা প্রমুখ (যাঁরা রামানুজনের সঙ্গে বা তাঁর সম্পর্কে কাজ করেছেন) রামানুজন-উদ্ভাবিত সূত্রগুলি ব্যাখ্যা করার জন্যে গভীর মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরাও সব কিছু ব্যাখ্যা করতে

পারেন নি, উত্তরসূরীদের আকৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত করার মতো অনেক কিছু এখনও রয়ে গেছে।

বস্তুত, রামানুজনের জীবন হচ্ছে একটি হিমবাহের মতো, যার অধিকাংশ জলের নিচে লীন হয়ে থাকে এবং অতি সামান্য অংশ উপরিভাগে দেখা যায়। রামানুজন ছিলেন এক পরম সাধক—যিনি গণিতসাধনার মাধ্যমে পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আত্মার অগ্নি অন্তরকে উদ্ভাসিত করেছিল এবং সাধকদের মতো তাঁর অন্তরশিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। জীবনের শেষদিকে তিনি যখন অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখনও এই অন্তরশিখা অনির্বাণ ছিল। ফলে শেষ জীবনেও তিনি গণিতে বিস্ময়কর অবদান রেখে যেতে পেরেছিলেন।

দারিদ্র্য-অনটনের কষাঘাত তাঁর মানসিক ধৈর্য বা বুদ্ধির প্রখরতা কখনও হ্রাস করতে পারে নি। চরম দারিদ্র্যের মধ্যে যখন তাঁর ও পরিবারের অন্যান্যদের দিন কাটছে, তখনও তিনি পাতার পর পাতায় আপন মনে অঙ্ক কষে যেতেন। এতে তাঁর বাবা তাঁকে প্রায়ই ভৎর্সনা করতেন: 'এভাবে পাতা ভরিয়ে যখন কোনো অর্থাগম হয় না, তখন শুধু শুধু পণ্ডশ্রম করে লাভ কি?' বাবার এই ভৎর্সনা সত্ত্বেও রামানুজন তাঁর গণিতচর্চায় অবিচলিত থাকতেন। কিন্তু আত্মীয়-পরিজন বা বন্ধু-বান্ধব কারো প্রতি রামানুজন কোনো বিদ্বেষ পোষণ বা দুর্ব্যবহার করতেন না। যে সব বন্ধু তাঁকে গণিতচর্চায় কোনোরকম সাহায্য করতে পারত না, তাদের কাছে রামানুজন ছিলেন গণিতরাজ্যের 'হিমালয় পর্বত'-স্বরূপ, যার উচ্চতা নির্ধারণ করা ছিল তাদের ধ্যান-ধারণার বাইরে।

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে রামানুজনকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সেখানে তিনি সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার করতেন এবং তাঁর ধর্মীয় আচার-আচরণ যথারীতি মেনে চলতেন। দু দশক আগে মহাত্মা গান্ধী যেমন ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনটি শপথ গ্রহণ করে-

ছিলেন—মদ, মাংস ও নারীসঙ্গ পরিহার করে চলবেন, রামানুজনও সেই আদর্শের অনুবর্তী হয়েছিলেন। একজন বিজ্ঞানী হিসাবে রামানুজনের এই ধরনের 'গোঁড়ামি' সেখানকার পাড়াপ্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধবেরা ভালো চোখে দেখতেন না, তাঁরা নানা উপহাস করতেন। কিন্তু রামানুজন তাতে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তাঁর গণিতচর্চার মধ্যে নিমগ্ন থাকতেন।

তাঁর অন্তর ও বহিঃসত্তার মধ্যে যে অপূর্ব সমন্বয় বিরাজ করত তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর মনের প্রশান্তিতে ও সদা হাস্যময় আচরণে। কোনো সময়েই তাঁকে বিরস, বিষণ্ণ বা বিরক্ত বলে মনে হত না। যে কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তিনিই তাঁর অন্তরঙ্গতা ও মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েছেন। অধ্যাপক ই. এইচ. নেভিলির কথায় বলতে গেলে—'রামানুজনের ব্যবহার ছিল আদর্শস্থানীয়। একারণে সকলেই তাঁর সখ্য ও সঙ্গ কামনা করতেন। সাফল্য বা খ্যাতি কোনো কিছুই তাঁর স্বভাব-সারল্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের মতে গণিতের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতা ছিল তুলনাবিহীন। কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-ভালবাসা প্রকাশের তাঁর নিজস্ব অদ্ভুত পদ্ধতি ছিল। এই বিস্ময়কর গণিত-প্রতিভা মানুষ হিসাবে ছিলেন অত্যন্ত সমাদরণীয়।'

রামানুজনের চোখ দুটি ছিল তাঁর মনের মুকুরস্বরূপ। শেশু আয়ার এবং রামচন্দ্র রাও-এর (যাঁরা রামানুজনের জীবনপ্রতিষ্ঠায় প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন) মতে 'রামানুজনের চেহারার বৈশিষ্ট্য ছিল সুস্থ দেহ, উচ্চতা ৫´ ৫´´, বড় মাথা, চওড়া কপাল ও কালো কোঁকড়ানো লম্বা চুল। তবে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল তাঁর কালো চোখ দুটি—যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি উজ্জ্বল। সে চোখ দুটি দেখলেই তাঁর অনন্ত-প্রতিভার দিশা পাওয়া যেত।'

যাঁরা বুদ্ধিজীবী বা মনীষী, তাঁদের চরিত্রে একটা দুর্বলতা হলো সততার অভাব। এই অসততা তাঁদের অন্তর-বাহিরকে ক্ষয় করে। কিন্তু যাঁরা সত্য-সাধক, তাঁরা অন্তরে-বাইরে সৎ না হয়ে পারেন

না। রামানুজনের জীবন বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই।

১৯১৭ সালের এক অপরাহ্নে রামানুজন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে লণ্ডন গণিত সমিতির (London Mathematical Society) কার্যবিবরণী দেখছিলেন। গাণিতিক বিশ্লেষণ সম্পর্কে ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক এল. জে. রোজার্স-এর (L. J. Rogers) একটি গবেষণাপত্র হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন। দেখে তিনি যেমন আনন্দিত তেমনি বিস্মিত হলেন। আনন্দিত এই কাজের সন্ধান পেয়ে; আর বিস্মিত এই জন্যে যে, এই বিষয়ে কোনো কিছু না জেনেই তিনি নিজে ১৯১২।১৩ সালে একই ফলে উপনীত হয়েছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হার্ডির কাছে ছুটে গেলেন এবং মুক্তকণ্ঠে রোজার্স-এর কাজের প্রশংসা করে বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন। হার্ডি এই কাজের নামকরণ করেন 'রোজার্স-রামানুজন অভেদ' (Rogers-Ramanujan Identities)। এ সম্পর্কে হার্ডি বলেছেন: 'রামানুজন যে ফলে উপনীত হয়েছেন তা রোজার্স পূর্বাহ্নেই প্রত্যাশা করেছিলেন, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোজার্সকে ছাড়িয়ে গেছেন রামানুজন।'

এই ধরনের নানা কাজের ক্ষেত্রে রামানুজনের মৌলিকত্ব সম্পর্কে নানা জনে প্রশ্ন তুলেছেন। এই প্রশ্নের সদুত্তর পেতে হলে অধ্যাপক হার্ডির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। কারণ একমাত্র তিনিই রামানুজনের নিবিড় সান্নিধ্যে এসেছিলেন এবং দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে একযোগে কাজ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে হার্ডি বলেছেন: 'রামানুজনের সমস্ত কাজ বিচার-বিশ্লেষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—তিনি যে সমস্ত কাজ করেছেন (যার মধ্যে প্রতিভার দীপ্তি ও ত্রুটিবিচ্যুতি দুই আছে) তা অপরের সহায়তা ছাড়া সম্পূর্ণ নিজেই করেছেন।'

এই বিষয়ে রামানুজনকে সরাসরি জিজ্ঞেস করে হার্ডি রহস্যের

সমাধান করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেন নি। কেন করেন নি বলতে গিয়ে হার্ডি মন্তব্য করেছেন: ‘এ বিষয়ে আমার ত্রুটি অবশ্যই স্বীকার করব। কারণ এখন আমরা রামানুজন সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাই, যার সমাধান আমি অনায়াসেই করতে পারতুম। রামানুজনের সঙ্গে প্রায় প্রতিদিনই আমার দেখা হত এবং তাঁকে একটু জেরা করে অধিকাংশ রহস্যের কিনারা করতে পারতুম। রামানুজন সাগ্রহে এসব প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিতে পারতেন এবং তাঁর কৃতিত্বের রহস্য সৃষ্টির জন্যে সত্যের বিন্দুমাত্র অপলাপ করতেন না। কিন্তু এ ধরনের কোনো প্রশ্নই আমি তাঁর কাছে কোনো দিন উত্থাপন করি নি। এজন্যে আমি এখন দুঃখিত। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু যায় আসে নি। তখন আমি যা করেছিলুম সেটাই ছিল স্বাভাবিক। প্রথমত, আমি জানতুম না যে রামানুজন শীঘ্রই ইহলোক ত্যাগ করে যাবেন। দ্বিতীয়ত, তাঁর কাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। গণিতজ্ঞ হিসাবে তাঁর গণিতচর্চার কাজটি কিভাবে সমাধান করবেন তা নিয়েই তিনি ব্যাপৃত থাকতেন। আর আমিও একজন গণিতজ্ঞ। তাই গণিতজ্ঞ হিসাবে রামানুজনের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর গবেষণার ইতিহাস জানার চেয়ে গবেষণার বিষয়টি নিয়ে আমাদের আলোচনা হত বেশি। প্রায় প্রতিদিনই তিনি যখন আমাকে আধ ডজন নতুন গবেষণার ফল দেখাতেন, তখন এটা-ওটা জানা উপপাদ্য তিনি কিভাবে নতুন করে আবিষ্কার করেছেন সে-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে তাঁকে বিব্রত করা আমার পক্ষে হাস্যকর মনে হত।’

রামানুজনের গণিতচর্চার অবিরাম ধারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রামানুজন উদ্ভাবিত কিছু কিছু উপপাদ্য ও অনুমান ভ্রমাত্মক বলে পরে প্রমাণিত হয়েছে, তবু সেগুলি অজানা সত্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল এবং নতুন গবেষণার পথ প্রশস্ত করেছিল।

হার্ডিকে অনেক সময় প্রশ্ন করা হয়েছে—আপনি রামানুজনের

মধ্যে কোনো বিশেষ রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন কি? কিংবা অপরাপর গণিতজ্ঞদের অনুসৃত পদ্ধতি থেকে তাঁর গণিতচর্চার পদ্ধতি কি ছিল অন্যরকম?' এর উত্তরে হার্ডি বলেছেন: 'এ ধরনের প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমি দিতে পারব না। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব বিশ্বাস করি না। আমি মনে করি, সকল গণিতজ্ঞই সমস্যার গভীরে গিয়ে চিন্তা করেন এবং রামানুজনও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না।' রামানুজনের গণিত-প্রতিভার মূল্যায়ণ করতে গিয়ে হার্ডি বলেছেন, একমাত্র অয়লার বা জ্যাকবি'র সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁর তুলনা করা যেতে পারে।

অপর কেউ হলে হার্ডির এই প্রশস্তিতে পরম পরিতৃপ্তি বোধ করতেন। কিন্তু রামানুজন ছিলেন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি হার্ডির স্তুতির প্রতিবাদ করে সবিনয়ে বলতেন: 'না মিঃ হার্ডি, আপনি ভুল করছেন। আমি এই স্তুতির মোটেই যোগ্য নই। অয়লার এবং জ্যাকবি হচ্ছেন গণিতরাজ্যে অবিস্মরণীয় পুরুষ, তাঁদের সঙ্গে আমার কোনো তুলনাই হয় না। গণিতের ক্ষেত্রে আমি অতি সামান্য, নগণ্যই বলতে গেলে, কিছু করেছি। ভুলত্রুটি নিয়ে আমি একজন সামান্য মানুষ—সত্যে উপনীত হবার জন্যে শুধু প্রয়াস করে যাচ্ছি।'

রামানুজনের এই উক্তি নিছক বিনয় ভাষণ নয়। সত্যসত্যই তিনি যশ বা পদমর্যাদা আকাঙ্ক্ষা করতেন না। মনের প্রশান্তিতে গণিতের মাধ্যমে সত্যের উপাসনা করা ছাড়া আর কিছুই তিনি কোনোদিন কামনা করেন নি। তাঁর অন্তরে গণিত-চিন্তার যে উদ্বেল ধারা নিরন্তর বহে চলত, তার ফসল তিনি অকাতরে বিলিয়ে দিতে চাইতেন। এই দেওয়ার কোনো বিরাম ছিল না। নিঃশেষে দেওয়ার এই আকুলতা তাঁর অন্তরকে নিয়ত দহন করত এবং তা-ই তাঁর জীবনাবসান ত্বরান্বিত করেছিল। সৃষ্টির বেদনার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই উপলব্ধি করতে পারবেন এই আকুলতা—'প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।'

রামানুজনের প্রতিভা কোনোদিন বদ্ধ জলার মতো আবদ্ধ হয়ে থাকে নি, তাঁর মনে নিত্য-নতুন চিন্তার মুক্তধারা নিরন্তর বহে চলত নিত্য-প্রবাহিণী স্রোতস্বিনীর মতো। তাঁর এই চিন্তাস্রোতের পয়োধারা পান করে উত্তরসূরীরা পেয়েছেন নতুন সৃষ্টির প্রেরণা।

গণিতচর্চার মর্মার্থ মুক্ত চিন্তায় নিহিত এবং জরা বা বার্ধক্য কোনোদিন এই চিন্তাধারাকে স্পর্শ করে না। যিনি প্রকৃত গণিত-সাধক, তিনি আত্মসমাহিত হয়ে সত্যের সন্ধানে নিয়ত নিয়োজিত থাকেন। শ্রীনিবাস রামানুজন ছিলেন এরই মূর্ত প্রতীক।

গণিতচর্চার বাইরে মানুষ রামানুজনকে নানা জনে নানাভাবে দেখেছেন। তাঁদের প্রতিবেদন থেকে মানুষ রামানুজনের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে একটা সম্যক পরিচয় আমরা পেতে পারি।

গণিতচর্চা নিয়ে যাঁরা সদাসর্বদা মাথা ঘামান, তাঁরা 'রসকষ-হীন' অসামাজিক মানুষ হন বলেই আমাদের সাধারণ ধারণা। কিন্তু রামানুজন সে ধরনের মানুষ ছিলেন না।

রামানুজন ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী, সামাজিক ও সহানুভূতিশীল মানুষ। তিনি রসিক ও সদালাপী ছিলেন বলে অন্যেরা তাঁর কথা শুনতে ভালবাসতেন। তাঁর কথাবার্তায় অহংবোধ বা আত্ম-প্রচার কখনও প্রকাশ পেত না। তিনি নিজের কথা তো নয়ই, তাঁর পরিবারের কথাও বিশেষ বলতেন না। মাঝে-মধ্যে শুধু তাঁর মায়ের কথা উল্লেখ করতেন।

রামানুজন ছিলেন কিছুটা লাজুক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তাই অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় তিনি নিজে বিশেষ কোনো কথা না বলে অপরের কথা মন দিয়ে শুনতেন। যদি কোনো বিষয়ে তাঁর মতামত কেউ জানতে চাইতেন, তিনি খোলা-খুলিভাবেই তা ব্যক্ত করতেন। কোনো বন্ধুর সঙ্গে বা অল্প কয়েকজনের মধ্যে কথা বলবার সময় দর্শন ও তাঁর অন্যান্য প্রিয় বিষয়ে বেশ উৎসাহ সহকারে তিনি আলোচনা করতেন।

রামানুজনের ব্যক্তিমানস ও স্বভাবচরিত্রের এক অন্তরঙ্গ পরিচয় আমরা পাই তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী জানকী দেবী প্রেরিত স্মৃতিচারণ থেকে। স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন : "মা-বাবার প্রতি রামানুজনের যেমন ছিল গভীর শ্রদ্ধা, তেমনি স্ত্রী ও ভায়েদের প্রতি ছিল তাঁর স্নেহ-ভালবাসা। মা'র প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার সীমা-পরিসীমা ছিল না। ছোটবেলায় তিনি মা'র সঙ্গে '১৫ ঘুঁটির খেলা' (15-point game) খেলতেন। এই খেলায় অনেক সময় গাণিতিক চাল দিয়ে সকলকে হতভম্ব করে দিতেন। গণিতচর্চায় তিনি সারা সময় সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিতেন। গণিতের মধ্যে তিনি যখন আত্মমগ্ন হতে যেতেন, তখন সময়ের জ্ঞান তাঁর থাকত না। যখন তিনি মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করতেন, তখন অফিসে যাবার আগে ও অফিস থেকে ফিরে এসে গণিত নিয়ে মেতে থাকতেন। সভাসমিতি বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না।

"কখনও কখন আহারের সময়েও তিনি গাণিতিক সমস্যায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তখন খাওয়া বন্ধ রেখে সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা করতেন, কিংবা তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে আবার গণিতে নিমগ্ন হতেন। আবার কোনো কোনো সময় তাঁর মা বা ঠাকুমা তাঁর হাতে 'সদম্' (সেদ্ধ চালের ডেলা-পাকানো একরকম খাদ্য) তুলে দিতেন, আর তিনি অঙ্ক কষতে কষতে কোনো ফাঁকে সেটা মুখে পুরে ফেলতেন। কখনও কখন আবার আহারের কথা তাঁকে মনে করিয়ে দিতে হত।

"তাঁর প্রিয় খাদ্য ছিল দই। যত পরিমাণ দই তাঁকে দেওয়া হোক না কেন, তিনি সাগ্রহে তা খেতেন। দই-ভাতের সঙ্গে আচারের চাইতে কলা, আম বা কাঁঠাল তিনি বেশি পছন্দ করতেন।

"রামানুজন যতদিন ভারতে ছিলেন, রান্না করতে জানতেন না। কিন্তু কেমব্রিজে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করতে শিখেছিলেন। তাঁর প্রিয় খাদ্যবস্তু ছিল 'পোঙ্গল' (ছোলা সেদ্ধ ও ভাতের মিশ্রণে একরকম খাদ্য)।

"অপরের প্রতি রামানুজন গভীর সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই অপরের দুঃখশোকে সান্ত্বনা জানাতে সবসময় তিনি এগিয়ে আসতেন।

"জ্যোতিষীদের মতো তিনি কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারতেন। নিজের পরমায়ু সম্বন্ধে নিজেই বলতেন, ৩৪ বছরের বেশি তিনি বাঁচবেন না। অন্যান্যদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি যা বলতেন, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলে যেত। ওষুধপত্রে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। এলোপ্যাথিক চিকিৎসা করাতে সহজে চাইতেন না, অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে রাজী করানো হত।

"মাত্র এক বছর কাল তাঁর সেবাযত্ন করার সুযোগ আমি পেয়েছিলুম। কারণ তাঁর মা ও ঠাকুমা গৃহস্থালী ব্যবস্থার সব কিছু তদারক করতেন। তিনি যখন পোর্ট ট্রাস্ট অফিসে কাজ করতেন তখন আমরা দুজনে একটি ভাড়া বাড়িতে একত্রে বাস করতুম। তারপর মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাবৃত্তি তিনি যখন লাভ করেন, তখন অপর একটি বাড়িতে আমরা দুজনে ছিলুম। তিনি কেমব্রিজে যাত্রার আগে অন্য একটি বাড়িতেও আমরা কয়েক মাসের জন্যে ছিলুম।

"অসুস্থ হয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে আসবার পর তাঁকে পরিচর্যা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তখন নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তাঁকে ভাত, লেবুর রস, ঘোল ইত্যাদি দিতুম এবং যখন যন্ত্রণার কথা বলতেন তখন পায়ে ও বুকে গরম জলের সেঁক দিতুম। তখন জল গরম করবার জন্যে যে দুটি পাত্র ব্যবহার করা হত সে দুটি তাঁর পরিচর্যার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এখনও আমার কাছে আছে।"

রামানুজন ছিলেন গভীর ধর্মানুরাগী এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি মনে করতেন, ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনের মধ্যে শুধু একটা আধ্যাত্মিক দিকই নেই, মানুষের জীবন সুশৃঙ্খলভাবে গড়ে তোলার একটা নির্দেশও পাওয়া যায় তাতে। এর দ্বারা আত্ম-সংযমের শিক্ষা পাওয়া যায়—যে

শিক্ষা মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও অন্য বৃহত্তর সাধনার পক্ষে পরম সহায়ক। তাই ধর্মীয় আচার-আচরণ অনুসরণ তাঁর কাছে নিছক প্রথাগত কর্তব্য পালনের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। এমন কি তাঁর গণিতচর্চাকেও পরমাত্মার সান্নিধ্যে উপনীত হবার সোপান বলে তিনি মনে করতেন। তাঁর মতে পরমাত্মাই হচ্ছেন মানুষের সমস্ত চিন্তা-ভাবনার পরম উৎস। আমাদের সকল বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বরের অজ্ঞেয় জগতের সঙ্গে এই বস্তুজগতের যোগসূত্র স্থাপন।

তাঁর এই গভীর ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরগত প্রাণ তাঁকে চরম দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যেও নির্বিকার ধীর-স্থির করে রাখতো। দুরারোগ্য ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৯-২০ সালে তিনি যখন ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে চেতপুটে শয্যাশায়ী হয়েছিলেন, তাঁর সেই অন্তিম কালের এক অন্তরঙ্গ চিত্র আমরা পাই তাঁর শ্যালক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের প্রতিবেদন-এ। তিনি লিখেছেন: 'রামানুজন তখন একটি আসবাবহীন বাড়িতে মাটিতে মাদুরের ওপর বালিশে মাথা দিয়ে সব সময় শুয়ে থাকতেন। সে সময় যন্ত্রণা ও দুর্বলতার দরুন তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে বা কথাবার্তায় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যেত না। এমন কি, কাউকে চিৎকার করে তিনি কথা বলতেন না, বা কোনোরকম বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি শয্যাশায়ী হয়ে না থাকলে কেউ বুঝতে পারতেন না যে, এই মানুষটি এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছেন।'

রামানুজন সরল অমায়িক নিরহঙ্কার বিনয়ী হলেও তাঁর আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান প্রখর ছিল। কেউ তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত করলে তিনি নীরবে তা সহ্য করতেন না। এই প্রসঙ্গে তাঁর কেমব্রিজ জীবনের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে।

গণিত বিষয়ে গবেষণার জন্যে তিনি যখন কেমব্রিজে অবস্থান করছেন, তখন রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক

জি. সি. চ্যাটার্জি সেখানে ছিলেন। তিনি রামানুজনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে বিয়ে করেন। বন্ধুর বিয়ের কথা শুনে রামানুজন খুবই আনন্দিত হন। এই উপলক্ষে নবদম্পতি ও আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে ট্রিনিটি কলেজ হোস্টেলে তাঁর আবাসে একদিন প্রীতিভোজে তিনি আমন্ত্রণ জানান। ভোজের পদগুলি তিনি উৎসাহ ও যত্নের সঙ্গে নিজের হাতে প্রস্তুত করেন। আমন্ত্রিতেরা যখন খেতে বসলেন, রামানুজন নিজের হাতে তাঁদের খাদ্য পরিবেশন করলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে দুজন মহিলা ছিলেন —অধ্যাপক চ্যাটার্জির নবপরিণীতা বধূ শ্রীমতী ইলা এবং সরোজিনী নাইডুর বোন মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের দুজনকে দু প্লেট স্যুপ দেবার পর তৃতীয়বার যখন দিতে গেলেন, তাঁরা আর নিতে চাইলেন না। হঠাৎ রামানুজনকে আর দেখা গেল না।

এক ঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন রামানুজন ফিরে এলেন না, তখন অধ্যাপক চ্যাটার্জি উদ্বিগ্ন হয়ে গেটে দরোয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, রামানুজনকে কোথাও যেতে দেখেছে কিনা। দারোয়ান জানালো, বেশ কিছুক্ষণ আগে রামানুজন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে কোথায় যেন চলে গেলেন। অভ্যাগতেরা ভেবেছিলেন, রামানুজন হয়তো কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসবেন। কিন্তু রাত ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরও যখন রামানুজনও ফিরে এলেন না, তখন তাঁরা উদ্বিগ্ন চিত্তে যে যাঁর আবাসের দিকে রওনা হলেন। কারণ রাত ১০টার পর কারো হোস্টেলে ঢোকবার বা হোস্টেল ছেড়ে যাবার নিয়ম নেই।

পরের দিন সকালেও যখন রামানুজন ফিরলেন না, তখন অধ্যাপক চ্যাটার্জি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। রামানুজনের অন্তর্ধানের কথা তিনি তাঁর বন্ধুদের জানালেন। পাঁচ দিন পরে অবশ্য তিনি রামানুজনের একটা টেলিগ্রাম পেলেন। তাতে টেলিগ্রাম করে পাঁচ পাউণ্ড মনিঅর্ডার করবার অনুরোধ রামানুজন জানিয়েছেন। ঠিকানা দিয়েছেন অক্সফোর্ডের। টেলিগ্রাম পেয়েই

অধ্যাপক চ্যাটার্জি রামানুজনকে টাকা পাঠিয়ে দিলেন এবং পরের দিন রামানুজন কেম্‌ব্রিজে তাঁর আবাসে ফিরে এলেন।

অধ্যাপক চ্যাটার্জি রামানুজনকে জিজ্ঞেস করলেন, হঠাৎ তিনি অক্সফোর্ডে চলে গিয়েছিলেন কেন?

উত্তরে রামানুজন বললেনঃ 'সেদিন আমার আবাসে প্রীতি-ভোজের সময় আমি যখন অভ্যাগত মহিলা দুজনকে খাদ্য পরিবেশন করছিলুম, তাঁরা খাদ্য গ্রহণ করতে অসম্মত হওয়ায় আমি অপমানিত বোধ করেছিলুম। আমি মর্মাহত হয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলুম এবং মনস্থ করেছিলুম যতক্ষণ ঐ মহিলা দুজন আমার আবাসে থাকবেন ততক্ষণ আর ফিরব না। তখন আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল। তাই সরাসরি অক্সফোর্ডে চলে গিয়েছিলুম। যখন টাকা ফুরিয়ে গেল, তখন আপনাকে টেলিগ্রাম করলুম এবং টাকা পেয়েই এখানে চলে এলুম।'

স্ত্রীর প্রতি রামানুজনের ছিল গভীর ভালবাসা। কিন্তু স্ত্রীর নামোল্লেখ করে কখনও কিছু বলতেন না, শুধু 'বাড়ি' বলে উল্লেখ করতেন।

কেম্‌ব্রিজে থাকাকালে অধ্যাপক চ্যাটার্জি প্রায়ই রামানুজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। অনেক সময় তিনি দেখতে পেতেন রামানুজন বিষণ্ণ ও উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছেন। এর কারণ জানতে চাইলে রামানুজন বলতেন; 'আমার বাড়ি আমাকে চিঠি লেখে নি।'

অধ্যাপক চ্যাটার্জি মুচকি হেসে ঠাট্টা করে বলতেন: 'তা বাড়ি তো চিঠি লিখতে পারে না, মানুষই চিঠি লেখে।'

এ কথায় লজ্জা পেয়ে রামানুজন মুখ রাঙা করে বলতেন: 'না, না, আমি ভালোই আছি। আমার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না।'

অপরের দুঃখকষ্টের প্রতি রামানুজনের ছিল গভীর সহানুভূতি ও দরদ। একাধিক ঘটনায় তাঁর এই মহৎ হৃদয়বত্তার পরিচয় আমরা পাই। তাঁর স্কুল-জীবনের একজন সতীর্থের প্রতিবেদনে জানা

যায়ঃ 'প্রবেশিকা পরীক্ষার ঠিক আগে আমি যখন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলুম, তখন রামানুজন প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে এসে পাঠ্যবিষয় পড়ে শোনাত। ইংল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসে যখন সে কুম্ভকোনমে কিছুদিন ছিল, তখন সত্তরোর্ধ্ব আমার খুড়িমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমাদের স্কুল-জীবনের সময় খুড়িমার সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং তিনি রামানুজনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।'

দারিদ্র্যের নির্মম রূপের সঙ্গে রামানুজন তাঁর জীবনের প্রারম্ভ কাল থেকেই পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান। সে কারণে ছোটবেলা থেকেই তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তাই গণিত বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্যে কেম্ব্রিজে থাকাকালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ যখন তাঁকে ১৯১৯ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করেন, তখন রামানুজন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্রে লিখেছিলেনঃ 'আমাকে আপনারা যে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি মঞ্জুর করেছেন, তা থেকে বাৎসরিক ৬০ পাউণ্ড আমার মা-বাবাকে দেবেন। আমার প্রয়োজনীয় খরচ মেটাবার পর যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা যেন দরিদ্র ও অনাথ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার বেতন ও পাঠ্যপুস্তক কেনবার জন্যে দেওয়া হয়।'

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের প্রতি রামানুজনের গভীর সহানুভূতি ও দরদের পরিচয় এই পত্রের ছত্রে ছত্রে সুপরিস্ফুট।

মানুষ রামানুজনের চরিত্রে নানা বৈপরীত্য আমাদের শুধু আবিষ্ট করে না, হতচকিতও করে। একদিকে তাঁর শিশু-সুলভ সরলতা, আত্ম-উদাসীনতা ও অপরের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও দরদ আমাদের যেমন বিমুগ্ধ করে, অপরদিকে তেমনি তাঁর ঐকান্তিক ধর্মপ্রবণতা ও ধর্মীয় আচার-আচরণ পালনে সংস্কারবদ্ধতা আমাদের বিস্মিত করে! আমাদের মনে হয়, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে তিনি যদি ধর্মীয় সংস্কার থেকে কিছুটা মুক্ত হতে পারতেন এবং নিরামিষ

খাদ্যাভাস অত কঠোরভাবে যদি অনুসরণ না করতেন, তা হলে হয়তো এত অকালে তাঁকে আমাদের হারাতে হত না।

রামানুজনের অকাল প্রয়াণের আক্ষেপ আমরা কিছুতে ভুলতে পারি না। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের অবসান ঘটে। তিনি যদি আরও দীর্ঘকাল জীবিত থাকতেন, তা হলে গণিত বিষয়ে আরও বহু মূল্যবান মৌল অবদান তিনি রেখে যেতে পারতেন নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটি কথাও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, মানুষের জীবনের সার্থকতা কেবলমাত্র সময়ের পরিমাপে নয়; সার্থকতা মানুষের কর্মকৃতিতে, তার অবদানে, তার প্রতিভার সাক্ষরে—'কীর্তি যস্য স জীবতি'।

পৃথিবীতে দীর্ঘায়ু নিয়ে বহু মানুষ বেঁচে থেকেছেন এবং থাকেন। কিন্তু কর্মকৃতির দিক থেকে, বা অবদানের দিক থেকে তাঁরা এমন কিছু পরিচয় রেখে যান নি, যার জন্যে তাঁদের আমরা স্মরণে রেখেছি। পক্ষান্তরে শঙ্করাচার্য, স্বামী বিবেকানন্দ, আচার্য হরিনাথ দে, তরু দত্ত প্রমুখ মানুষেরা তাঁদের স্বল্পায়ু জীবনে এমন মহান কর্মকৃতি ও অনন্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন, যার জন্যে আজ শত বা শতাধিক বছর পরেও তাঁদের আমরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তাই বলা হয়: 'Man lives in deeds, not in years'.

রামানুজনের অকাল জীবনাবসান আমাদের অন্তরে যে আক্ষেপ সৃষ্টি করে, তাতে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, স্বল্পায়ু জীবনকালে তিনি অনন্য-প্রতিভার যে আসামান্য পরিচয় রেখে গেছেন তা-ই তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে শুধু আমাদের কাছে নয়, বিশ্বের বিদগ্ধ জনের কাছেও। ক্ষণজন্মা রামানুজন ক্ষণপ্রভার মতো তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ছড়িয়ে বিশ্বজগৎ চমকিত করে গেছেন—যার দ্বিতীয় নজির আজও পাওয়া যায় নি এবং কোনোদিন পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

কবির ভাষায় আমরা বলতে পারি—

"It is not growing like a tree
That makes men better be
Or, standing like an oak
A full hundred year
To fall a log at last
Dry bald and sear.
A Lily of a day
Is fairer far in May
Though it blossoms but for a night."

মানুষ জীবনে কিসে হয় সার্থক ?
মহীরুহ হলে বাড়ে গৌরব ভার ?
শতাব্দী ধরে বাঁচে তো বিশাল ওক
তারপর দ্যাখো পরিণতি ঘটে তার—
অঙ্গে অঙ্গে বয়সের ক্ষত-ক্ষতি,
জরা আকীর্ণ শুকনো কাঠের গুঁড়ি ;
অথচ দ্যাখো কী গৌরবে পরিণতি
মে দিনেতে ফোটা ছোট্ট লিলির কুঁড়ি—
একটি রাতের আয়ুতেই জ্বালে আলো
জীবনেতে, 'লিলি' হওয়া ভালো, ঢের ভালো।

পরিশিষ্ট (ক)

জীবনপঞ্জী

১৮৮৭ ডিসেম্বর ২২ : এরোদে মাতামহীর গৃহে জন্ম। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও কোমলতা দেবীর জ্যেষ্ঠ সন্তান।

১৮৯২ : প্রাইমারী স্কুলে যোগদান।

১৮৯৭ নভেম্বর : প্রথম শ্রেণীতে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৮৯৮ জানুয়ারী : কুম্ভকোনম টাউন হাইস্কুলে যোগদান।

১৯০৩ ডিসেম্বর : প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। গণিত-প্রতিভার লক্ষণ প্রকাশ।

১৯০৪ : কুম্ভকোনম্ কলেজে এফ-এ ক্লাশে যোগদান, জুনিয়ার সুব্রহ্মনিয়াম বৃত্তিলাভ।

১৯০৫ : গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে কম নম্বর পাওয়ায় এফ-এ ক্লাশের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অনুত্তীর্ণ।

১৯০৬ : প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে এফ-এ পরীক্ষা প্রদান। গণিতে শত নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন নম্বর না পাওয়ায় অনুত্তীর্ণ। শিক্ষাজীবনের ইতি।

১৯০৯ : শ্রীবাস্তব গোত্রের ৯ বছর বয়স্কা জানকী দেবীর সঙ্গে বিবাহ।

১৯১১ : ভারতীয় গণিত সমিতির পত্রিকায় প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশ।

১৯১২ : জানকী দেবীর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে স্বামীগৃহে আগমন।

" মার্চ ১ : মাদ্রাজ পোর্ট ট্রাস্টের হিসাব বিভাগে মাসিক ৩০ টাকা বেতনে করণিক পদে যোগদান।

১৯১৩ জানুয়ারী ১৬ : কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জি. এইচ. হার্ডিকে রামানুজনের প্রথম পত্র প্রেরণ।

" এপ্রিল ৭ : রামানুজনকে ২ বছরের জন্যে মাসিক ৭৫ টাকা বিশেষ বৃত্তিদানের উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদন।

১৯১৩ এপ্রিল ১২ : পয়লা মে থেকে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বৃত্তি গ্রহণের ইচ্ছাপ্রকাশ।

" মে ১ : পোর্ট ট্রাস্ট থেকে ২ বছরের জন্যে বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গবেষকছাত্র হিসাবে যোগদান।

১৯১৪ জানুয়ারী ১১ : অধ্যাপক হার্ডির আহ্বানে কেম্‌ব্রিজে যাবার ইচ্ছাপ্রকাশ।

" ফেব্রুয়ারী ১২ : রামানুজনের ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকালে ২ বছরের জন্যে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি সরকার কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকালীন অধ্যাপক তহবিল থেকে মঞ্জুর।

" মার্চ ১৭ : 'নেভাসা' জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা।

" এপ্রিল ১৪ : লণ্ডনে উপস্থিতি, কেম্‌ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে যোগদান।

" জুন ১১ : লণ্ডন গণিত সমিতির সভায় অধ্যাপক হার্ডি কর্তৃক রামানুজনের গণিত বিষয়ক ফলাফল সংক্রান্ত গবেষণাপত্র পাঠ।

১৯১৫ ডিসেম্বর ২০ : বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাশকালীন অধ্যাপক তহবিল থেকে আরও এক বছরের জন্যে রামানুজনকে বৃত্তি মঞ্জুর।

১৯১৬ মার্চ : গবেষণাকার্যের স্বীকৃতিতে ট্রিনিটি কলেজ থেকে রামানুজনকে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান।

" অক্টোবর ১৮ : আরও একবছরের ছুটি মঞ্জুর।

১৯১৭ মার্চ : অসুস্থ হওয়ায় ওয়েলস, ম্যাটলক এবং লণ্ডন স্বাস্থ্যাবাসে চিকিৎসা।

১৯১৭ অক্টোবর ১৮ : গণিতশাস্ত্রে মৌল অবদানের স্বীকৃতিতে ট্রিনিটি কলেজের ফেলো মনোনীত ; কাজ

বা আবাস সম্পর্কে শর্ত ছাড়াই বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড বৃত্তি প্রদত্ত।

১৯১৮ ফেব্রুয়ারী ২৮ : গণিতশাস্ত্রে অনন্যপ্রতিভার স্বীকৃতিতে লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত; হার্ডির অভিনন্দন।

" নভেম্বর ২৬ : রামানুজনের অসুস্থতার কথা বিবেচনা করে স্বল্পকালের জন্যে তাঁকে ভারতে প্রেরণে হার্ডির প্রস্তাব।

" ডিসেম্বর ৯ : গণিতশাস্ত্রে অবদানের স্বীকৃতিতে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট কর্তৃক ১৯১৯ সালের পয়লা এপ্রিল থেকে ৫ বছরের জন্যে রামানুজনকে বাৎসরিক ২৫০ পাউণ্ড অনুদান মঞ্জুর।

১৯১৯ জানুয়ারী ১১ : বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান গ্রহণ করে রামানুজনের কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ ও দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্যে অভিপ্রায়জ্ঞাপন।

" মার্চ ১৩ : 'নাগোয়া' জাহাজযোগে ইংল্যাণ্ড থেকে ভারত অভিমুখে যাত্রা।

" মার্চ ২৭ : বোম্বাই-এ উপস্থিতি ও সংবর্ধনা।

" এপ্রিল ২ : মাদ্রাজে উপস্থিতি ও সংবর্ধনা।

" জুলাই-সেপ্টেম্বর : স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্যে কোডুমুডি, কোয়াম্বাটুর ও কুম্ভকোনমে অবস্থান।

সেপ্টেম্বর-অকটোবর : রামানুজনকে আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারারের প্রস্তাব এবং সিণ্ডিকেটের সদস্যদের সাহায্য দানের সম্মতি।

১৯২০ ফেব্রুয়ারী-মার্চ : শারীরিক অবস্থার অবনতি : মাদ্রাজে চেতপেটে স্ত্রী ও অন্যান্যদের দ্বারা পরিষেবা।

" এপ্রিল ২৬ : মাত্র ৩২ বছরে ২০ বছর বয়স্কা স্ত্রী জানকী দেবী, মা-বাবা, ভাইদের ও মাতামহীকে রেখে নিঃসন্তান অবস্থায় মহাপ্রয়াণ।